প্রেমেন্দ্র মিত্রের

ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প

অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির

৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ়, ১৩৬৪
জুন, ১৯৫৭
তৃতীয় মুদ্রণ
আষাঢ়, ১৩৬৯
জুন, ১৯৬২
প্রকাশ করেছেন
অমিয়কুমার চক্রবর্তী
অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির
৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,
কলকাতা—১২
ছেপেছেন
পঞ্চানন চক্রবর্তী
মহামায়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৯, গোয়াবাগান স্ট্রীট,
কলকাতা—৬
প্রচ্ছদ এঁকেছেন
সমীর রায়চৌধুরি

দাছুমণিকে দিলাম
দাছু

ছোটদের কাছেও 'শ্রেষ্ঠ গল্পের' ঢেউ পৌঁছেছে দেখছি। পৌঁছোক, তাতে লাভ বই ক্ষতি নেই। শুধু, শ্রেষ্ঠ নামের মান থাকলেই হল। কারণ ছোটদের বেলা কোথাও এতটুকু ফাঁকি সজ্ঞানে রাখার মত অপরাধ আর কিছু নেই। বড়দের মোটা চামড়ায় যা সয়, ছোটদের নরম বাড়তি শরীর মনে তাই বিষ হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের দেশে ছোটদের অনেক আশ্চর্য লেখক আমরা পেয়েছি, এটা আমাদের সৌভাগ্য কিন্তু সেইসঙ্গে একটা আফশোসের কথা এই যে, ছোটদের বইএর রাজ্যে কোনরকম পাহারাই নেই। যার যখন খুশি ছাড়পত্র ছাড়াই সেখানে ঢুকতে পারে। আর কোনরকম ধরা-কাট নেই বলেই যাদের ভোঁতা কলম কোথাও চলে না তারাই বেশি করে ভিড় করে, ছোটদের ওপর কলমবাজি করতে। তাইতে সাত নকলে আসল খাস্তা হবার জোগাড় হলেও আইন করে তো আর ছোটদের জগতের পারঘাটায় পুলিশ মোতায়েন করা যায় না। ছোটদের আগলাবার দায় তাই গুরুজনদের নিতে হবে। রাস্তার নোংরা ভেজাল খাবার ছোটদের খেতে দিতে যদি বাধে, তাহলে বইএর বেলা আরো বেশি হুঁশিয়ার হওয়া যে দরকার এইটুকু না বুঝলে নয়। খারাপ খাবারে হয়ত দুদিনের অসুখ, কিন্তু বাজে বইএ একেবারে মনের ভিতই দেয় কাঁচিয়ে।

বাজে লেখার বিরুদ্ধে এত কথা বলে নিজেই কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে কাঁপছি আসল আদালতের অন্তিম রায়ের অপেক্ষায়।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প সিরিজ

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প
প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প
কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প
শিবরাম চক্রবর্তীর ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প
সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প
মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প
মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প
বুদ্ধদেব বসুর ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প
আশাপূর্ণা দেবীর ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প
সুকুমার দে সরকারের ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প
মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প
লীলা মজুমদারের ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প
রবীন্দ্রলাল রায়ের ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প
বনফুলের ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প
মৌমাছির ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প
হেমেন্দ্রকুমারের ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প
জরাসন্ধের ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প

প্রতি বই দুই টাকা

গোপন বাহিনী

পৃথিবীতে অনেক রকম যুদ্ধ হয়েছে। ছলে বলে কৌশলে নানা ভাবে এক দেশ আর এক দেশকে জয় করেছে। কিন্তু সামান্য একটা রাজ্য ইকোয়েডর তার প্রবল পরাক্রান্ত উদ্ধত ও অত্যাচারী প্রতিবেশী পেরুকে যেভাবে জব্দ করেছিল তার তুলনা আর কোথাও মেলে না। আজ সেই যুদ্ধের গল্পই বলব।

দক্ষিণ আমেরিকার সমস্ত রাজ্যগুলির ভেতর সবচেয়ে গরিব বুঝি ইকোয়েডর। সামান্য কয়েকটা খনি, পাহাড়ের ধারে কিছু জঙ্গল ও পশ্চিমের সমুদ্রকূলে সামান্য গুয়ালো পাখির তৈরি কিছু জমির সার ছাড়া তার আর কোন আয়ের উপায় নেই। দক্ষিণ দিকে তার প্রতিবেশী রাজ্য হল পেরু। পেরুর অবস্থা ইকোয়েডরের চেয়ে অনেক ভাল। চাষবাস সেখানে বিশেষ কিছু হয় না বটে কিন্তু গুয়ালো পাখির জমানো মাটির সার বিক্রি করে তার প্রচুর আয়। তাছাড়া আয়তনে ইকোয়েডরের চেয়ে বড় বলে তার খনিজ সম্পদও অনেক বেশি।

দক্ষিণ আমেরিকার রাজ্যগুলি অনেকটা ঝগড়াটে অসভ্য মানুষের মত। রাজ্যগুলি সর্বদাই এ-ওর পেছনে লেগে আছে। কেমন করে পরস্পরকে জব্দ করবে সেই ফন্দিই তারা আঁটছে সর্বদা। একজনের যদি একটু অবস্থা ফিরেছে তাহলে তো আর কথা নেই, আশপাশের প্রতিবেশীরা তার দৌরাত্ম্যে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠবে।

পৃথিবীতে চাষের সারের জন্যে কস্কেট অত্যন্ত দরকারি। এই কস্কেট সম্পদ পেরুর মত পৃথিবীর আর কোন রাজ্যের নেই। তার

পশ্চিম সমুদ্র-উপকূলে অসংখ্য গুয়ালো পাখি অফুরন্তভাবে এই কম্পেটের সার তৈরি করে চলেছে। সেই কম্পেট পৃথিবীর বাজারে চড়া দামে বিক্রি করে পেরু কয়েক বছর হল বেশ ফেঁপে উঠেছিল। তারপর আর কী! পেরু রাজ্যের দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না বললেই হয়। তার দাপটে প্রতিবেশী ছোট ইকোয়েডরের প্রাণান্ত হবার উপক্রম।

একে ইকোয়েডর গরিব, না আছে তার অর্থবল না আছে লোকবল। তার ওপর গত দুবছর কটোপ্যাক্সি ও শিম্বোরাজো নামক দুটি আগ্নেয়গিরির উৎপাতে সে বেশ কাবু হয়ে আছে। এমন সময় নতুন পয়সার গরমে পেরু তার ওপর জুলুম শুরু করলে। পেরু ও ইকোয়েডরের মাঝখানের সীমান্তরেখা সামান্য নয়। অর্থাৎ কোন নদী বা সীমান্তরেখা ধরে এই দুটি রাজ্যের সীমা নির্দিষ্ট হয়নি, কাল্পনিক একটা রেখা দুটি রাজ্যকে ভাগ করে রেখেছে। হঠাৎ একদিন দেখা গেল, পেরু রাজ্যের কল্পনা অত্যন্ত বেড়ে যাচ্ছে। ইকোয়েডরের সীমা পেরিয়ে তার একদল সৈন্য হঠাৎ একদিন ছাউনি পেতে বসল। ইকোয়েডর মৃদু একটু আপত্তি জানালো। কিন্তু কে কথা শোনে। পেরু সৈন্যেরা উত্তরে বরং আরো একটু এগিয়ে গিয়ে ছাউনি গাড়ল। ইকোয়েডর এবার পেরুর কাছে কৈফিয়ৎ চেয়ে পাঠালো একটু কড়া ভাবেই, কিন্তু এতে হল হিতে বিপরীত। পেরু রেগে আগুন হয়ে উঠল। এত বড় আস্পর্ধা ইকোয়েডরের মত একটা ছোট রাজ্যের যে সে কৈফিয়ৎ চেয়ে পাঠায়! পেরুর সৈন্য যেখানে ছাউনি গেড়েছে সেটাই যে পেরুর সীমান্তরেখা নয় তা কে বললে? পেরু ইকোয়েডরের প্রতিনিধিদের রীতিমত ধমকে বিদায় করে দিলে।

অবস্থা খারাপ হলে প্রবলের হাতে মানুষকে অনেক সহ্য করতে হয়। ইকোয়েডর এ অপমানের বিরুদ্ধেও বিশেষ কিছু করত না। কিন্তু হঠাৎ আর-এক গোলমাল বেধে গেল।

বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়—কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। পেরুর সৈন্যদলের প্রত্যেকটি লোক এক-একটি নবাব। তাছাড়া ধরে আনতে বললে বেঁধে আনতে তারা কখনও ভোলে না। ইকোয়েডরের রাজ্যে গিয়ে ছাউনি গেড়ে তারা তাদের নবাবি মেজাজের ভাল করেই পরিচয় দিতে আরম্ভ করলে। যেখানে সৈন্যেরা আড্ডা গেড়েছে, সেখানে ইকোয়েডরের চাষী ও পশুপালকদের বাস। সেই পশুপালকেরা সৈন্যদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। সৈন্যেরা খেয়ালমত চাষীদের বাড়িতে গিয়ে হানা দেয়, জোরজবরদস্তি করে তাদের কাছে খাবার আদায় করে, ইচ্ছেমত তাদের পালিত পশু ধরে নিয়ে এসে ভোজের আয়োজন করে।

মানুষের দেহে আর কত সয়। ছাউনির কাছাকাছি চাষী ও পশুপালকেরা অনেক সহ্য করে একদিন মরীয়া হয়ে ক্ষেপে উঠল। তার আগের দিন এক চাষী সৈন্যদলের আবদার মেটাতে একটু আপত্তি করেছিল বলে তারা মজা করে তার গোলাবাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে। সৈন্যদলের এই মজা করাটা চাষী ও পশুপালকেরা কিন্তু অন্য দৃষ্টিতে দেখেছিল। অত্যাচার তাদের সহ্যশক্তি তখন ছাড়িয়ে গেছে। ভেতরে ভেতরে তারা প্রতিশোধের জন্যে তখন প্রস্তুত হচ্ছে।

সেদিন সৈন্যদের একটা দল বেড়াতে বেড়াতে সেখানকার এক অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন পশুপালকের বাড়ি গিয়ে উঠেছে। উঠেই তাদের হরেক-রকম বায়না—ভাল মাংস রেঁধে নিয়ে এস, ভাঁড়ারে খাবার-দাবার কি আছে ভাল বার কর, সবচেয়ে ভাল ঘরটায় আজ আমরা থাকব—তার ব্যবস্থা কর···ইত্যাদি। পশু-পালকের লোকজন চাকর-বাকর অনেক। সাধারণ মারামারি হলে তারা কটা সৈনিককে মাটিতে ধুলো করে গুঁড়িয়ে দিতে পারে। কিন্তু সৈন্যদের পিছনে আছে সমস্ত বাহিনী। তাদের অস্ত্রশস্ত্র সব আছে। সেই ভয়েই বোধহয় সেনর গোভানি ও

তাঁর লোকজন মনের রাগ মনেই রেখে নীরবে সৈনিকদের সমস্ত অন্যায় আবদার সহ্য করছিলেন। কিন্তু সৈনিকেরা ক্রমশই মাত্রা বাড়িয়ে তুলল।

সৈনিকেরা খেতে বসেছে। সেনর গোভানিকে বাধ্য হয়ে তাদের খাওয়া-দাওয়ার তদারক করতে হচ্ছে, এমন সময় নিজের প্লেট থেকে প্রকাণ্ড এক মাংসের চাঁই তুলে এক সৈনিক ডাকলে, গোভানি!

সেনর গোভানি শান্তভাবে বললেন, কী?

সৈনিক উদ্ধতভাবে বললে, এইরকম বিশ্রী রান্না মাংস কী বলে তুমি আমাদের খেতে দিয়েছ!

সেনর গোভানি এ-ঔদ্ধত্যেও বিচলিত না হয়ে সংযত ভাবে বললেন, কী করব! আমাদের এখানে ওর চেয়ে ভাল রান্না হয় না।

হয় না! বটে! তবে এ মাংস তুমিই খাও! বলে সৈনিক সেই মাংস সেনর গোভানির মুখের ওপর ছুঁড়ে মারল। মাংসের ডেলা সেনর গোভানির মুখে গিয়ে সজোরে লাগল। মুখ থেকে তাঁর জামায় পর্যন্ত মাংসের কাই মাখামাখি হয়ে গেল।

সৈনিকেরা সে দৃশ্য দেখে উচ্চস্বরে সবাই হেসে উঠল। অপমানে ক্ষোভে সেনর গোভানি তখন কাঁপছেন।

এ অপমান অসহ্য! সেনর গোভানির লোকজন এবার আর স্থির থাকতে পারল না। যে সৈনিক মাংসের ডেলা ছুঁড়েছিল, একজন এসে এক প্রচণ্ড ঘুসিতে তাকে চেয়ার থেকে উল্টে মাটিতে চিৎপাত করে দিল। তারপরেই শুরু হল মারামারি।

চাষীরা তখন রীতিমত ক্ষেপে গেছে, পরিণামের ভয় আর নেই। সৈনিকদল তাদের কাছে মার খেয়ে একরকম ছাতু হয়ে গেল বললেই হয়। বেদম প্রহারের ফলে তাদের একজন মারাও গেল পরদিন।

পেরু বুঝি এমনি একটি ছিদ্রই খুঁজছিল। সমস্ত রাজ্যে তাদের রটে গেল যে ইকোয়েডরের লোকেরা পেরুর নিরীহ সৈনিকদের অসহায় অবস্থায় পেয়ে মেরে ফেলেছে। এর প্রতিকার চাই।

ইকোয়েডরের শাসনকর্তারা হঠাৎ পেরুর এক কড়া চিঠি পেয়ে অবাক হয়ে গেলেন। পেরু রাজ্যের নিরীহ প্রজাদের মেরে ফেলার দরুণ ইকোয়েডরের কাছে পেরু শুধু কৈফিয়ৎ চেয়ে পাঠায় নি, ক্ষতিপূরণ স্বরূপ আরো কিছু চেয়ে পাঠিয়েছে। খেসারত স্বরূপ ইকোয়েডরকে তার গুয়াকুইল বন্দরটি পেরুকে দিতে হবে।

এমন অদ্ভুত কথা কেউ কখনো শোনেনি। পেরুর দম্ভ অত্যন্ত বেড়েছে, কিন্তু সামান্য একটা মারামারির ফলে যা হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পেরু যে এই বন্দরটা চেয়ে বসতে পারে এতটা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। পেরুর নিজের কোন ভাল বন্দর নেই। গুয়াকুইল বন্দরের জন্যে সে যে বহুদিন ধরে ইকোরেডরকে ঈর্ষা করে এটাও ঠিক। কিন্তু তাই বলে এই অর্থহীন ছুতোয় সে যে সেটা দাবি করতে পারে একথা ভাবা যায় না!

পেরুর আবদার যত অসম্ভবই হোক, তাকে একটা উত্তর তো দিতে হবে। ইকোয়েডর জানালে যে, সীমান্তের কাছে সৈন্যদের সঙ্গে ইকোয়েডরের পশুপালকদের যে মারামারি হয়েছে তার জন্যে সত্যি কথা বলতে গেলে পেরুই দায়ী। তারাই সীমান্তরেখা অন্যায়ভাবে অতিক্রম করেছে। যাই হোক, মারামারির কারণ ও বিবরণ জানবার জন্যে রাজধানী থেকে রাজপ্রতিনিধি কয়েকজন যাচ্ছেন। তাঁদের অনুসন্ধানের ফলাফল জানা গেলে যা উচিত ইকোয়েডর তাই করবে।

ইকোয়েডরের কথা যে যুক্তিযুক্ত, তা সবাই স্বীকার করবে। কিন্তু পেরু এ উত্তরে সন্তুষ্ট হওয়া দূরে থাক, ভীষণ রেগে গিয়ে

একেবারে চরম পত্র দিয়ে বসল। তিনদিনের মধ্যে ইকোয়েডরের লোক যেন গুয়াকুইল বন্দর ছেড়ে চলে যায়—না গেলে তাদের বিপদ আছে।

এ তো একেবারে রীতিমত যুদ্ধ ঘোষণা! বোঝা গেল পেরু বহুদিন ধরে যে-কোন ফিকিরে এমনই যুদ্ধ বাধাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে। তাদের সাজসরঞ্জামও বোধহয় সম্পূর্ণ হয়েছে! কিন্তু ইকোয়েডর যে মোটেই তৈরি নেই! ইকোয়েডরের শাসন-কর্তারা রীতিমত ভড়কে গেলেন। ইকোয়েডরের উত্তরে কলম্বিয়া। পেরুর উৎপীড়ন ও অন্যায় আবদারের কথা জানিয়ে শাসনকর্তারা কলম্বিয়ার কাছে সাহায্য চাইলেন। দূরে হলেও ব্রেজিল সরকারের কাছেও লোক পাঠানো হল। কিন্তু ফল কিছুই হল না। চোরে চোরে সবাই মাসতুতো ভাই। পরের বিপদে সাহায্য করা দক্ষিণ আমেরিকার রাজ্যগুলির স্বভাব নয়। ফাঁপরে পড়ে একরকম নতজানু হয়েই ইকোয়েডরের কর্তারা পেরুকে ন্যায়ের দোহাই দিয়ে তার অন্যায় দাবির কথাটা ভেবে দেখতে বললেন। কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। পেরু জানালে, গোয়াকুইল বন্দর তার চাই।

নিরুপায় হয়ে শাসনকর্তারা যুদ্ধের জন্যে এবার প্রস্তুত হবার চেষ্টা করলেন। বন্দরটা তো আর অমনি দিয়ে দেওয়া যায় না! গুয়া-কুইল বন্দর গেলে আর ইকোয়েডরের রইল কী?

কিন্তু মুখের কথা বার করলেই তো আর যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হওয়া যায় না! পেরু বড়লোক হওয়ার পর যুদ্ধের বিস্তর সরঞ্জাম সংগ্রহ করে ফেলেছে। তার এরোপ্লেন আছে, তার নতুন ধরনের কামান আছে, তার গোলাগুলি অঢেল, লোকজনও তার ঢের বেশি। ইকোয়েডরের শুধু যে লোকজন নেই তা নয়, এরোপ্লেন বা নতুন ধরনের কামান-বন্দুকও তার কম। তবু তাকে সাজতে হল।

পেরু যে তিন দিন ইকোয়েডরকে সময় দিয়েছিল, সে-তিনদিন শেষ হওয়ামাত্র তাদের বাহিনী ওপর ও নিচ থেকে গুয়াকুইল আক্রমণ করলে। বন্দরের লোকেরা নিচেকার সৈন্যবাহিনীকে যদি বা ঠেকালে, ওপরের এরোপ্লেনের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারলে না। ওপর থেকে বোমা ফেলে পেরুর লোকেরা বন্দরের অধিবাসীদের একেবারে ব্যতিব্যস্ত করে তুললে। একদিন, দুদিন কোনরকমে কাটল, কিন্তু তৃতীয় দিন বন্দর রাখা দায় হয়ে উঠল। পেরু সেইসঙ্গে জানালে যে ইকোয়েডর এখন যদি সহজে গুয়াকুইল বন্দর ছেড়ে না দেয়, তাহলে শুধু তো গুয়াকুইল বন্দর নিয়ে পেরু-সম্রাট সন্তুষ্ট থাকবে না, যুদ্ধে তাদের যে অর্থব্যয় হয়েছে তার ক্ষতি-পূরণ স্বরূপ সমুদ্রের তীরের গুয়ালো পাখির বাসস্থান যে ইকো-য়েডরে আছে, তাও কেড়ে নেবে।

ভীত হয়ে ইকোয়েডরের শাসনকর্তারা এক সভা আহ্বান করলেন সেইদিনই। গুয়াকুইল বন্দর তো রাখা যাবেই না, তার ওপর গুয়ালো পাখির বাসাও যদি দিতে হয়, তাহলে তো সর্বনাশ! অনেক মন্ত্রীই তাই ভেতরে-ভেতরে গুয়াকুইল বন্দর পেরুকে ছেড়ে দেবার পক্ষপাতী। সভায় তাঁরা সেই প্রস্তাবই করবার মতলব করছেন।

বিকেলে সভা বসবে। রাষ্ট্রপতি দুধারে রক্ষীপ্রহরী নিয়ে সভায় চলেছেন গাড়ি চড়ে। হঠাৎ গাড়ির সামনে একটা গোলমাল হল। কে একটা পাগলা-গোছের লোক তাঁর গাড়ির পথ রুখেছে। সে নাকি রাষ্ট্রপতির সঙ্গে কথা বলতে চায়। প্রহরীরা তাকে ঘাড়ধাক্কা মেরে তাড়িয়ে দিলে, কিন্তু লোকটা তবু নাছোড়বান্দা। পাগলের মত ছুটে এসে গাড়ির দরজা ধরে সে বললে, দোহাই আপনার রাষ্ট্রপতি, আমায় দুটো কথা বলবার অনুমতি দিন।

রাষ্ট্রপতি অবাক হয়ে দেখলেন, পাগলা-গোছের লোকটার বয়স অত্যন্ত অল্প। তার ব্যগ্রতা দেখে তাঁর কেমন একটু কৌতূহল

হল। প্রহরীরা আবার এসে যুবকটিকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করছিল। তাদের বাধা দিয়ে রাষ্ট্রপতি যুবককে তাঁর গাড়ির ভেতর এসে বসতে বললেন। তারপর আবার গাড়ি চালাতে হুকুম দিয়ে তিনি যুবকটির দিকে চাইলেন। মাথার উস্কোখুস্কো চুলের ভেতর হাত বুলিয়ে যুবকটি এক নিশ্বাসে বলে গেল, আমার নাম আলেপ্পো গোভানি। ইকোয়েডরের সীমান্তে যে সিনর গোভানির লোকের সঙ্গে সৈনিকদের মারামারি হয়, আমি তাঁরই ছেলে। যখন মারামারি হয় তখন আমি বাড়িতে ছিলাম না। পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো আমার একটা নেশা। কটোপ্যাক্সির ধারে আণ্ডিস পাহাড়ের জঙ্গলে তখন আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি।

রাষ্ট্রপতির এবার সত্যি সন্দেহ হল যুবকটি পাগল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু আমায় এসব শোনানো কেন?

বলছি, রাষ্ট্রপতি। বেড়ানো শেষ করে আমি কদিন আগে বাড়িতে ফিরেছিলাম। ফিরে কী দেখলাম জানেন? আমাদের কাছে মার খেয়ে সেই আক্রোশে পেরুর সৈন্যরা আমাদের সমস্ত বাড়িঘর পুড়িয়ে দিয়েছে। আমার বাবা নিহত। আমার ভাইবোনেরা কোথায় গেছে কোন পাত্তা নেই।

রাষ্ট্রপতি বলতে যাচ্ছিলেন, আমি তার প্রতিকার কী—

তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে গোভানি বললে, প্রতিকার আপনাকে করতে হবে না। আমি তার উপায় জানি। সেই কথাই আপনাকে বলতে এসেছি।

রাষ্ট্রপতি পাগলের কথায় একটু হেসে বললেন, তুমি কী প্রতিকার করবে! কাল তো যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যাবে।

যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যাবে? গোভানির চোখমুখ দিয়ে যেন আগুন বেরুচ্ছিল! এই অপমান লাঞ্ছনা মাথা পেতে নিয়ে কাপুরুষের মত আপনারা যুদ্ধ বন্ধ করবেন? গুয়াকুইল বন্দর রক্ষা করবেন না?

কী করে আর করব! বলে রাষ্ট্রপতি হতাশভাবে সামনের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর যেন নিজের মনে বললেন, আমাদের অস্ত্র নেই, সৈন্য নেই। এখন আমাদের অবস্থা খারাপ।

গোভানি উত্তেজিত স্বরে বললে, সৈন্য নেই কি রকম? আমাদের কোটি-কোটি অক্ষৌহিণী সৈন্য আছে, সমস্ত পেরু আমরা শ্মশান করে দিতে পারি!

দুঃখের ভেতরেও পাগলের কথায় একটু হেসে রাষ্ট্রপতি বললেন, তাই নাকি?

আপনি আমার কথায় বিশ্বাস করছেন না? তা না করাই স্বাভাবিক। কিন্তু আগে আমার কথা শুনুন। বলে গোভানি রাষ্ট্রপতির আরো কাছে মুখ এনে মৃদুস্বরে অনেকক্ষণ ধরে কি বললে। শুনতে শুনতে দেখা গেল রাষ্ট্রপতির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। সমস্ত কথা শুনে সোজা হয়ে বসে গোভানির পিঠ চাপড়ে তিনি বললেন, এ যদি সম্ভব হয়, তাহলে সমস্ত ইকোয়েডর তোমার কাছে ঋণী হয়ে থাকবে চিরকাল!

এ সম্ভব যে হবেই! বলে, এতক্ষণে গোভানি একটু হাসলে।

রাষ্ট্রপতি তবু ভুরু কুঁচকে বললেন, কিন্তু মন্ত্রীসভা যদি আমার কথায় কান না দেয়! তারা ভয়ে অস্থির হয়ে আছে। যেকোন সর্তে তারা সন্ধি করতে পারলে বাঁচে।

গোভানি বললে, আপনি ভুলে যাচ্ছেন রাষ্ট্রপতি যে যুদ্ধের সময় বিশেষ ক্ষমতা দ্বারা আপনি মন্ত্রীসভা ভেঙে দিয়ে সমস্ত দায়িত্ব নিজে স্কন্ধে নিতে পারেন।

সেদিন সভায় যা হল তা আর বলে কাজ নেই। অধিকাংশ মন্ত্রী ও রাজকর্মচারীরা পেরুর সঙ্গে সন্ধি করার পক্ষপাতী। গুয়াকুইল বন্দর দিলে যদি তারা সন্তুষ্ট হয় তাহলে তাই দেওয়া হোক। দেশের নইলে আরো বেশি ক্ষতি হবে। একা রাষ্ট্রপতি তাদের অনেক বোঝালেন। এভাবে হার স্বীকার করলে পেরুর

আস্পর্ধা। ক্রমশই বেড়ে যাবে—আজ গুয়াকুইল বন্দর যারা চেয়েছে কাল তারা সমস্ত রাজত্বই যে চাইবে না তা কে বলতে পারে। তাছাড়া এ অন্যায় সহ্য করবার চেয়ে প্রাণ দেওয়া ভাল! কিন্তু মন্ত্রী-সভার অধিকাংশই তাঁর বিরুদ্ধে। কিছুতেই যখন তাদের বোঝানো গেল না, তখন হঠাৎ রাষ্ট্রপতি সকলকে ঘোষণার দ্বারা চমকে দিলেন। মন্ত্রীরা যদি তাঁর কথায় না সায় দেন তাহলে তিনি সমস্ত সভা ভেঙে দেবেন। যুদ্ধের সময় এরকম ভাঙবার ক্ষমতা তাঁর আছে। সমস্ত সভা নিস্তব্ধ। একজন অনেকক্ষণ বাদে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করলে, আপনি তাহলে এখন কী করতে বলেন? আরো সৈন্য সংগ্রহ, যুদ্ধের ব্যয়ের জন্যে অতিরিক্ত কর আদায়?

আমি সেসব কিছুই বলি না। শুধু গুয়াকুইল বন্দর ছাড়তে অস্বীকার করে আমরা কটোপ্যাক্সির আশেপাশের পাহাড়ের জঙ্গলে আগুন লাগাবো।

পাহাড়ে আগুন লাগবেন? খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে থেকে হঠাৎ সমস্ত সভার লোক হেসে উঠল। রাষ্ট্রপতির মাথা নিশ্চয়ই খারাপ হয়েছে। একজন বললে, আপনি বলছেন কী?

আমি ঠিকই বলছি। আমাদের শুধু আত্মরক্ষা নয়, পেরুর অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবার একমাত্র উপায় পাহাড়ের জঙ্গলে আগুন লাগানো। আজ এই মুহূর্তেই আমার বন্ধু এই আলেগ্রে গোভানির নেতৃত্বে একটি সৈন্যবাহিনীকে পাহাড়ের জঙ্গলে আগুন লাগাবার জন্যে পাঠানো হবে।

সভাসদেরা এ-কথার পর বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে বিদায় নিলেন। রাষ্ট্রপতির যে মাথা খারাপ হয়েছে এবং তাঁকে যে পদ থেকে সরানো দরকার, এ বিষয়ে তাঁরা সকলেই একমত। কিন্তু রাষ্ট্রপতিকে তো আর মুখের কথায় পাগল বলে দূর করে দেওয়া যায় না, তার জন্যে আয়োজন চাই। তাঁরা সেই আয়োজনই করবার সঙ্কল্প করলেন।

তারপর একদিন গেল, দুদিন গেল। ইকোয়েডরে ভয়ানক অশান্তি। রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে মন্ত্রীরা দেশের লোককে এত উস্কে দিয়েছেন যে একটা অন্তর্বিপ্লব যেকোন মুহূর্তে ঘটতে পারে। এদিকে গুয়াকুইল বন্দর যায়-যায়। পেরুর আকাশ-বাহিনী অবিরাম বোমা-বর্ষণ করে বন্দর প্রায় গুঁড়িয়ে ফেলেছে। ওদিকে ইকোয়েডরের সেনারা গোভানির নেতৃত্বে পাহাড়ের জঙ্গলে আগুন দিচ্ছে।

তৃতীয় দিন অধিকাংশ মন্ত্রী রাষ্ট্রপতির কাছে পদত্যাগ-পত্র দাখিল করলেন। তাঁরা রাজ্যে নতুন নির্বাচনের পক্ষপাতী। কুইটো নগরের অবস্থা ঠিক ঝড়ের আগের আকাশের মত। বিপ্লব আসন্ন। বিকেলবেলা সশস্ত্র একদল নাগরিক চলল রাষ্ট্রপতির প্রাসাদের দিকে। তাঁকে হয় পদত্যাগ করতে হবে নয় বন্দী হতে হবে।

নাগরিকেরা প্রাসাদের দরজায় গিয়ে হানা দিয়েছে। রাষ্ট্রপতি দেখা করবার জন্যে আসছেন শোনা গেছে। এমন সময় এ কী ব্যাপার? হঠাৎ নির্মেঘ আকাশে অকাল-সন্ধ্যা হল কেমন করে?

নাগরিকদের একজন নেতা জানলা দিয়ে তাকিয়ে বললেন, হঠাৎ অন্ধকার হল কেন বুঝতে পারছি না তো!

সেই মুহূর্তে সামনের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকে রাষ্ট্রপতি বললেন, ও সাধারণ অন্ধকার নয়, সেনর। আকাশ অন্ধকার করে আমাদেরই গোপন বাহিনী চলেছে পেরুকে শিক্ষা দিতে।

সবিস্ময়ে সবাই বললে, তার মানে?

তার মানে বাইরে গিয়ে দেখবেন চলুন। বলে রাষ্ট্রপতি পথ দেখিয়ে সবাইকে বাইরে নিয়ে গেলেন। তখন পশ্চিম আকাশের দিকে তাকিয়ে সমস্ত নাগরিক একেবারে অবাক! সূর্যকে একেবারে আড়াল করে কালো ঝড়ের মেঘের মত চলেছে পঙ্গপালের বাহিনী দক্ষিণ দিকে। তাদের সম্মিলিত পাখার শব্দে সমস্ত আকাশ গমগম করছে।

সেইদিকে তাকিয়ে রাষ্ট্রপতি বললেন, সৈন্য দিয়ে আর আমাদের যুদ্ধ করতে হবে না। ওরাই আমাদের হয়ে সমস্ত পেরু সাত দিনে শ্মশান করে দেবে।

*   *   *

রাষ্ট্রপতির কথা যে মিথ্যা নয়, ইতিহাসেই তার সাক্ষ্য আছে। পঙ্গপাল বাহিনী পেরুর ওপর দিয়ে ঠিক প্রলয়ের ঝড়ের মতই সেবার বয়ে গেছল। ধাতু আর পাথর ছাড়া কিছুই তারা নষ্ট করতে বাকি রাখেনি বললেই হয়। প্রথম কয়েক দিন পঙ্গপালের উৎপাত সত্ত্বেও পেরু যুদ্ধ করবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ক্রমেই তা অসম্ভব হয়ে উঠল। পঙ্গপালের রাশের ভেতর পড়ে শুধু যে এরোপ্লেন অচল হল তা নয়, ধীরে ধীরে যুদ্ধের রসদ গেল উবে। শেষকালে সমস্ত দেশে খাদ্যের টান পড়ল। তারপরেই দেখা দিল দুর্ভিক্ষ। গুয়াকুইল নেবে কী, নিজের দেশ সামলাতেই তখন পেরুর প্রাণান্ত। দশ বছরে পেরু এ ধাক্কা সামলাতে পারেনি।

পৃথিবীর ইতিহাসে এমন উপায়ে যুদ্ধজয় আর কোন দেশ করেনি। এবং এ উপায় উদ্ভাবিত হয়েছিল পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্যে ব্যাকুল এক যুবকের মাথায়। আলেপ্পো গোভানি আণ্ডিজের জঙ্গলে ঘুরতে-ঘুরতে পঙ্গপালের এক বিরাট উপনিবেশ দেখতে পায়। সে-উপনিবেশে তখন শিশু পঙ্গপালেরা সবে লাফিয়ে বেড়াবার মত বড় হয়েছে। এই উপনিবেশ পরে দেশের এমন কাজে লাগবে, তখন অবশ্য সে তা ভাবেনি। কিন্তু পিতৃহত্যার প্রতিশোধের উপায় ভাবতে-ভাবতে এই পঙ্গপাল বাহিনীকে কাজে লাগাবার কথা তার মনে আসে। উপনিবেশের উত্তরের জঙ্গলে আগুন লাগিয়ে দিয়ে পঙ্গপালকে দক্ষিণদিকে চালিয়ে দেবার কৌশলও তার উদ্ভাবন।

বিশ্বম্ভরবাবুর বিবর্তনবাদ

অতি অল্পের জন্যে বিশ্বম্ভরবাবুর নামটা বিজ্ঞানের ইতিহাসে সোনার অক্ষরে আর লেখা হল না।

হল না, সোনার বা সোনা কেনার অর্থের অভাবে অবশ্য নয়, কারণ বিশ্বম্ভরবাবু ইচ্ছে করলে গোটা ইতিহাসটাই সোনায় বাঁধিয়ে দিতে পারতেন, সে সঙ্গতি তাঁর আছে। কিন্তু সামান্য একটু গণনার ভুলেই সব মাটি হয়ে গেল।

বিশ্বম্ভরবাবু বৈজ্ঞানিক— তাঁর এ ধারণা আমরা সকলেই দৃঢ়ভাবে ধারণ করে থাকি; অর্থাৎ আমরা যারা তাঁর বৈঠকখানায় নিত্য ধর্না দিই এবং সকালবেলা চা কেক বিস্কুট ইত্যাদি সহযোগে এবং বিকেল-বেলা লুচি মোহনভোগ ইত্যাদি জলযোগ সমভিব্যাহারে তাঁর বিচিত্র সব বৈজ্ঞানিক গবেষণা গলাধঃকরণ করে থাকি।

বিশ্বম্ভরবাবুর কোন গবেষণা অবশ্য এ-পর্যন্ত বেশি এগোয়নি, তিনি প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যায় আমাদের নানারকম অপরূপ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের পরিকল্পনা শোনান। তাতে, আমাদের সামনে যে উপাদেয় আহার্যগুলি ধরে দেওয়া হয় সেগুলি উদরসাৎ ও হজম করতে আমাদের কোন অসুবিধেই কোনদিন হয় না। বরং খাবারের চাট হিসেবে বৈজ্ঞানিক নিত্য-নতুন গবেষণা আমাদের ভালই লাগে। গবেষণা যেদিন একটু কঠিন হয়, সেদিন জলযোগটাও আমাদের কিছু গুরুতর হয়ে ওঠে। যেদিন মাছ ধরবার নতুন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি তিনি ব্যাখ্যা করেন, সেদিন চিংড়ি মাছের কাটলেট ও ভেটকি মাছ ভাজার বহরটাও

আমরা বাড়িয়ে নিই। ইঁদুরের দৌরাত্ম্য নিবারণের নতুন পন্থা যেদিন তিনি আবিষ্কার করেন সেদিন—না, সেদিন আমরা মূষিক-জাতির বিলোপে তাঁকে সাহায্য করি না, তবে মূষিক যাদের আহার বলে শোনা যায় সেই চীনাদের হোটেল থেকে রসাল কিছু রান্না আনিয়ে নেবার ব্যবস্থা করি।

বিশ্বম্ভরবাবুর বৈজ্ঞানিক গবেষণাগুলির জন্যে যে ত্রুটিই থাক, সে-গুলি যে অনন্যসাধারণ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ইঁদুরের দৌরাত্ম্য নিবারণের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটাই ধরা যাক না কেন?

সেদিন সন্ধ্যার কথা আমার স্পষ্টই মনে আছে। ছোট ছোট টেবিল সামনে নিয়ে আমরা বিশ্বম্ভরবাবুকে ঘিরে বসেছি তাঁর দরাজ বৈঠকখানায়। তাঁর চাকর আমাদের টেবিলে টেবিলে চিকেন-স্যাণ্ডউইচ আর চা দিয়ে গেছে। অমন চিকেন-স্যাণ্ডউইচ পেটে পড়লে মগজ আপনা থেকেই পরিষ্কার হয়ে যায়, বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। আমাদেরও হবে, তাতে আশ্চর্যের কী আছে!

বিশ্বম্ভরবাবু তাঁর জন্যে বিশেষভাবে তৈরি চেয়ারে—বুদ্ধি যেমন সূক্ষ্ম বিশ্বম্ভরবাবুর শরীর সেই পরিমাণে মোটা বলে সাধারণ চেয়ারে তিনি আঁটেন না—একটু নড়ে-চড়ে হঠাৎ বললেন, আজ আমাদের আলোচ্য বিষয় হল ইঁদুর—

ইঁদুর! গণেশ তার প্রথম স্যাণ্ডউইচটায় সবে এক কামড় দিয়েছে, সাপের ছুঁচো গেলার মত অবস্থায় না গিলতে, না ফেলতে পেরে জড়ানো স্বরে কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললে, ইঁদুর কী! এই যে শুনলাম চিকেন-স্যাণ্ডউইচ!

আমরা সবাই হেসে উঠলাম। কিন্তু গণেশকে তখন থামানো শক্ত—ঐ জন্যে চীনে-ফিনে হোটেলের নাম করলে আমি চটে যাই! যা কুচিকুচি করে কেটে চটকে দিয়েছে! কে বুঝবে বল তো···

বিশ্বম্ভরবাবু এবারে বাধা দিয়ে বললেন, আহা, স্যাণ্ডউইচে

ইঁদুরের কথা বলছি না, আমি বলছি আমাদের আলোচনার বিষয় আজ ইঁদুর !

ওঃ, তাই বলুন ! গণেশের গলা দিয়ে স্যাণ্ডউইচ নামল এতক্ষণে।

হ্যাঁ, ইঁদুরের কথা বলছি। ইঁদুর যে আমাদের কত অনিষ্ট করে তা নিশ্চয় আপনাদের বুঝিয়ে বলতে হবে না। কিন্তু এ পর্যন্ত দৌরাত্ম্য-নিবারণের যত উপায় আবিষ্কৃত হয়েছে কোনটাই সম্পূর্ণ সফল হয়নি। কেমন করে সফল হবে? বৈজ্ঞানিক মূল নীতিই যে তাতে অনুসরণ করা হয়নি। সে-কারণে জাঁতা ও খাঁচাকলে একটা-আধটা ইঁদুর ধরা পড়ে মারা পড়ে বটে, কিন্তু সমগ্র ইঁদুর-জাতির প্রকৃতির কোন পরিবর্তন হয় না। তারা বংশানুক্রমে মানুষের শত্রুতা করেই চলে।

বিশ্বম্ভরবাবু একটু থামতেই আমরা চট করে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে নিলাম। তিনি আবার বললেন, কিন্তু উপায় কি নেই? ইঁদুরের সঙ্গে মানুষের এ বিরোধ কি ঘুচিয়ে দেওয়া যায় না? চোর ডাকাতকে কী করে আমরা জব্দ করি, তাদের জন্মগত কুপ্রবৃত্তি সংশোধন করে দিই?

গণেশ বলে উঠল, ঠেঙিয়ে !

বিশ্বম্ভরবাবু মাথা নাড়লেন, উঁহু, ঠেঙিয়ে নয়। আধুনিক বিজ্ঞানে তা বারণ। আধুনিক বিজ্ঞান বলে—

আধুনিক বিজ্ঞান কী বলে জানবার আগে আমরা আরেকটা করে স্যাণ্ডউইচ তাড়াতাড়ি শেষ করে সবল হয়ে নিলাম।

—আধুনিক বিজ্ঞান বলে, চোর ডাকাত বদমাসকে শাস্তি দিয়ো না। তাদের বদ্‌রোগের গোড়া উপড়ে ফেলে তাদের স্বাভাবিক মানুষ করে তোল। ইঁদুরেদেরও তাই করতে হবে। তাদের বংশে যাতে আর মানুষের অনিষ্ট করার বদখেয়াল না দেখা দেয়, তাদের প্রকৃতি যাতে শুধরে যায়।

বিশ্বম্ভরবাবু তারপর সবিস্তারে তাঁর মুষিকোদ্ধার পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করছিলেন। স্যাণ্ডউইচের সঙ্গে তার অনেকটাই হজম হয়ে গেছে। যৎসামান্য যা বাকি আছে তা অনেকটা এইরকম—বিশ্বম্ভরবাবু ইঁদুরের চরিত্র-সংশোধনের জন্যে বিশাল একটা যন্ত্র নির্মাণ করতে চান। সে যন্ত্রটি হবে বিশাল একটি গোলকধাঁধা-খাঁচা বিশেষ। যেদিক দিয়ে ঢুকবে সেদিক দিয়ে ইঁদুর বেচারার আর বেরুবার উপায় থাকবে না। ক্রমাগত আঁকা-বাঁকা ঘোরানো পথে তাকে ঘুরে চলতে হবে সামনের দিকে। আর সেই পথের বাঁকে-বাঁকে থাকবে তার শিক্ষার ব্যবস্থা। যেমন, প্রথম খানিকটা এগিয়ে যাবার পরই দেখা যাবে উপাদেয় এক টুকরো রুটি। ইঁদুরের সাধ্য কী সে-লোভ সামলায়! কিন্তু লোভে পড়ে কামড় দিতে গেলেই মুস্কিল। সামনের আয়নায় তৎক্ষণাৎ এক মস্ত হুলো বেরালের ছবি ভেসে উঠবে। ইঁদুরকে তৎক্ষণাৎ দৌড় দিতে হবে ভয়ে। অনেক দূর দৌড়ে গিয়ে সে হাঁপিয়ে উঠবে। ক্ষিদেও পাবে নিশ্চয়। তখন সামনে দেখা যাবে ভাল একটা বাঁধানো বই কি সিল্কের কাপড় যা কেটে কুটিকুটি করবার জন্যে ইঁদুরের দাঁত নিশপিশ করে উঠবে। কিন্তু দাঁত চালিয়েছে কি লুকানো গ্রামোফোন থেকে মার্জার-সঙ্গীত বেজে উঠবে—ম্যা-ও-ও! আবার ছুট ছাড়া গতি নেই। ছুটতে ছুটতে ইঁদুরের পা ছিঁড়ে যাবার জোগাড়! ক্ষিদেয় পেট চোঁ চোঁ! তখন দেখা যাবে পথের একধারে কাটা ঘাস, আরেক ধারে খোলা কৌটোয় আমসত্ত্ব কি ডালের বড়ি। ইঁদুর প্রথমে ঘাস খাবে না, আমসত্ত্ব কি বড়ির দিকেই তার টান। কিন্তু কৌটোর দিকে মুখ বাড়াতেই গলায় লেগে যাবে ফাঁস। একেবারে আধমরা হবার পর সে ফাঁস খুলে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে আবার বেরাল-কুকুরের ডাক। আবার তাকে পালাতে হবে। তারপর অনেক নাকানি-চোবানির পর তাকে নানাভাবে ঘাসের মাহাত্ম্য

বুঝিয়ে, অবশেষে পেটের জ্বালায় ঘাস খাইয়ে খাঁচা থেকে বের করে দেওয়া হবে। বিশ্বম্ভরবাবুর মতে এ-খাঁচা থেকে সে একেবারে সাত্ত্বিক ইঁদুর হয়ে বেরুবে। তার দৃষ্টান্ত ও উপদেশে হাজার ইঁদুরের জীবনের গতি বদলে যাবে। ঘাস যে কত প্রচুর, ঘাস খাওয়া যে কত নিরাপদ তা বুঝে তারা মানুষের অনিষ্ট করা একদম ছেড়ে দেবে। গোলকধাঁধা-যন্ত্র থেকে দলে-দলে এইরকম প্রচারক ইঁদুর বার করে পৃথিবীর মূষিকজাতিকে চিরদিনের মত উদ্ধার করাই বিশ্বম্ভরবাবুর উদ্দেশ্য।

বিশ্বম্ভরবাবুর এইসব সাধু বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্য যতদিন মৌখিক ব্যাখ্যার বেশি এগোয় নি ততদিন বেশ চলছিল। আমরাও সঙ্গে-সঙ্গে রসনার সদ্ব্যবহার করে তাঁকে উৎসাহ দিতে ত্রুটি করিনি।

কিন্তু হঠাৎ ত্র্যহস্পর্শ ঘটে আমাদের বৈঠক ভেঙে গেল। সেই দুঃখের কাহিনীই বলি।

ত্র্যহস্পর্শ-যোগটি এইরকম: বিশ্বম্ভরবাবু কিছুদিন থেকে ডারুইনের বিবর্তনবাদ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলেন। কোথা থেকে কীভাবে আমরা মানুষ হয়েছি সকাল বিকেল তাই বোঝানোই হয়েছিল তাঁর কাজ।

ছেলেবেলা পাকা কুল ও ডাঁসা পেয়ারার লোভে গাছে আর কে না উঠেছে! কিন্তু তাই বলে মানুষ জাতটাই তাদের ছেলেবেলায় গাছ থেকে নেমে এসেছে, এ মতটা আমাদের তেমন মনঃপূত হচ্ছিল না। এমনকি সকাল-বিকেলের জলযোগের ঘটাটা বাড়িয়েও আমাদের অখণ্ড মনোযোগ আকর্ষণ করতে না পেরে বিশ্বম্ভরবাবু একদিন একটি জ্যান্ত গেছো বাঁদর আমদানি করে বসলেন। বৈঠকখানার বাইরে বারান্দায় শেকল দিয়ে সেটাকে বেঁধে রাখা হল আমাদের শিক্ষার সুবিধের জন্যে।

বাঁদরের সঙ্গে আমাদের গাছতুতো জ্ঞাতিত্বের সম্পর্ক যখন আমরা বিশ্বম্ভরবাবুর বক্তৃতার ভয়ে প্রায় মেনে নিয়েছি, তখন

হঠাৎ কোথা থেকে আমাদের পাড়ায় এক প্রাণান্তকর চুলকোনার আবির্ভাব হল। সে-চুলকোনা আমাদের সকলকে চঞ্চল করে তো তুললেই, বিশ্বম্ভরবাবুর বৈজ্ঞানিক বপুকেও বাদ দিলে না। বিবর্তনবাদ, বাঁদর ও চুলকোনা—এই ত্র্যহস্পর্শ-যোগ থেকেই বিশ্বম্ভরবাবুর নতুন গবেষণার সূত্রপাত এবং আমাদের বৈঠকের অপঘাত।

বিশ্বম্ভরবাবু সেদিন তুপুরবেলা বৈঠকখানায় বসে বিবর্তনবাদের একটা মোটা বই আয়ত্ত করবার চেষ্টা করছেন। সঙ্গে সঙ্গে সর্বাঙ্গে হস্তচালনাও চলছে চুলকোনার তাড়নায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চুলকোনারই জয় হল। হবারই কথা। যুগপৎ হাত ও মাথা তো চালানো যায় না! বিশেষ করে যখন মনে হয় যে, চুলকোনা যিনি সৃষ্টি করেছেন সেই পরম কারুণিক পরমেশ্বরের পক্ষে মাত্র তুটি হাত মানুষকে দেওয়া অত্যন্ত অবিচার হয়েছে। রাবণের মত বাহুর বাহুল্য যাদের আছে, চুলকোনা একমাত্র তাদেরই অঙ্গে শোভা পায় ও সুখ দেয়।

শুধু হাতে সুবিধে করতে না পেরে বিশ্বম্ভরবাবু পাখার বাঁট প্রয়োগ করতে বাধ্য হন এবং তারপর পাগলের মত বেরিয়ে আসেন বারান্দায়। বিবর্তনবাদের বই অবহেলিত হয়ে পড়ে থাকে।

বারান্দায় কিন্তু যে দৃশ্য তাঁর চোখে পড়ে তাতে খানিকক্ষণের জন্যে চুলকোনার জ্বালাও বুঝি তিনি ভুলে যান। তাঁর এমন ভুক্ত-ভোগী সমব্যথী যে সেখানে আছে তাও তিনি এতদিন লক্ষ্য করেন নি! গাছতুতো জ্ঞাতিত্বের নতুন পরিচয় লাভ করে তিনি চমৎকৃত হয়ে যান। তিনি ও তাঁর বাঁদর, তুজনেরই এক জ্বালা; বাঁদরের চুলকোনা ক্রনিক ও তাঁর ক্ষণিক, এইমাত্র তফাৎ।

খানিকক্ষণ উভয়ের চুলকোনার পাল্লা চলে, তারপর হঠাৎ এক আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক সত্য বিশ্বম্ভরবাবুর মনে প্রতিভাত হয়, নিউটনের মনে যেমন হয়েছিল গাছ থেকে আপেল পড়তে দেখে।

চুলকোনা! চুলকোনা! চুলকোনাতেই সমস্ত রহস্যের মীমাংসা' চুলকোনাতেই বিবর্তনের সূত্রপাত। চুলকোনাই বৈজ্ঞানিক ধাঁধার উত্তর—মিসিং লিঙ্ক।

সেদিনকার সান্ধ্য বৈঠকেই—পাখা নয়, পাখার বাঁট চালাতে চালাতে বিশ্বম্ভরবাবু তাঁর নতুন থিয়োরির পত্তন করেন।

বাঁদর! বিবর্তনবাদের মূর্তিমান এই যে প্রমাণ, একে আপনারা লক্ষ্য করেছেন ভালো করে? কেউ করেছে এ-পর্যন্ত? বলুন দেখি কী তার বিশেষত্ব, কী সে করে?

গণেশ বলে, কী আর করে, বাঁদরামি।

বিশ্বম্ভরবাবু অধৈর্য হয়ে ওঠেন—না না, হল না।

আমরা সবাই নানারকম পর্যবেক্ষণ-শক্তির পরিচয় দিই। কেউ বলি,—বাঁদর গাছে গাছে লাফায়, কেউ বলি,—মুখ ভ্যাংচায়, কেউ বলি, —কিচির-মিচির করে; কিন্তু বিশ্বম্ভরবাবু সকলের ভুল সংশোধন করে বলেন,—না; বাঁদর গা চুলকোয়, সারা দিনরাতই চুলকোয়। তার চুলকোনা কোন জন্মে সারে না।

আমরা এই অভাবিত আবিষ্কারে বিমূঢ় হয়ে বসে থাকি, বিশ্বম্ভরবাবু তাঁর থিয়োরি আরও সরলভাবে বুঝিয়ে দেন। বাঁদরের সঙ্গে আমাদের এই যে প্রভেদ সে কেবল চুলকোনার দরুন। চুলকোনা যে কী বস্তু তা আমরা সকলেই জানি। চুলকোনার সময় মানুষের আর জ্ঞান থাকে না। কোন বিষয়ে মনোযোগ দেবার ক্ষমতা থাকে না। বুদ্ধি থেকেও তা কাজে লাগে না। বাঁদরদেরও হয়েছে তাই। বুদ্ধি তাদের আছে, কিন্তু চুলকোনায় তারা এমন ব্যতিব্যস্ত যে সে-বুদ্ধি খাটাতে পারে না। স্থির হয়ে একদণ্ড বসতে না পারলে বুদ্ধির ব্যবহার করবে কী করে! মানুষ যে বাঁদরের চেয়ে উন্নতি করেছে সে কেবল তার চুলকোনা এমন দুরারোগ্য নয় বলে। আজ বাদে কাল বৈজ্ঞানিকদেরও তিনি স্বীকার করিয়ে ছাড়বেন যে, প্রথম যে বাঁদরের চুলকোনা সেরে

গেছল তার থেকেই মানুষের সভ্যতা শুরু। চুলকোনা সারিয়ে তাদের সভ্য করে তোলা যায়।

বিশ্বম্ভরবাবুর প্রস্তাবের কোন প্রতিবাদ হয় না।

সমারোহ সহকারে তার পরদিনই বাঁদরের চর্মরোগ সারাবার আয়োজন শুরু হয়। ডাক্তারখানা থেকে দামি দামি মলম আসে, কার্বলিক সাবান বাক্স-বাক্স খরচ হয়ে যায়।

কিন্তু ফল তেমন সুবিধের হয় না। দেখা যায় চুলকোনা সারবার আগেই বাঁদর বেচারার পেটের রোগ শুরু হয়ে গেছে। সে নাকি তার গায়ের মলম চেটেই সাবাড় করে দেয়।

অ্যালোপ্যাথির বদলে কবিরাজি এবং তারপর হোমিয়োপ্যাথির ব্যবস্থা যখন হয় তখন বাঁদরের অবস্থার বেশ একটু পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। লম্ফ-ঝম্ফ ছেড়ে সে কাত হয়ে শুয়েই থাকে দিনরাত।

গণেশ সংশয়ের সুরে বলে, বেচারা বোধহয় চিকিৎসার চোটে টেঁসেই গেল।

বিশ্বম্ভরবাবু চটে ওঠেন রীতিমত,—চিকিৎসার দোষটা কী ?

গণেশ বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে বলে, চিকিৎসাটাই হয়ত দোষ। চুলকোনাটাই হল ওর বাঁদরামি। সেটাই যদি সেরে গেল তবে ও বাঁচবে কিসের জন্যে ?

তুমি ছাই বোঝ ! বিশ্বম্ভরবাবু বিরক্ত হয়ে ওঠেন,—এই শান্ত-শিষ্ট হওয়া, এটাই হল উন্নতির লক্ষণ। ওর বাঁদরামি কেটে যাচ্ছে।

কিন্তু বাঁদরামি কেটে গেলেও সভ্য হবার আগ্রহ তার ভেতর দেখা যায় না।

বিশ্বম্ভরবাবু নানারকম বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-পদ্ধতি পরীক্ষা করেন। বাঁদরটা কাত হয়ে শুয়েই থাকে, কেবল মাঝে-মাঝে দন্তবিকাশ করে—সেটা হাসির না দুঃখের বোঝা যায় না ঠিক।

অবশেষে গণেশের মাথা থেকেই বুদ্ধি বেরোয় একদিন। ব্যাপারটা সে-ই তলিয়ে বোঝে।

ও কিছুতেই কিছু শিখবে না, সে মন্তব্য করে।

কেন? বিশ্বম্ভরবাবু জিজ্ঞাসা করেন অবাক হয়ে।

অত লজ্জা থাকলে কেউ কিছু শেখে! গণেশ গম্ভীরভাবে বলে।

লজ্জা আবার কিসের? আমরা সবাই অবাক হয়ে প্রশ্ন করি।

লজ্জা ওর ল্যাজের।

ঠিক কথাই তো! ল্যাজই হল বানরের বা, ওটা বাদ দিলেই আর তফাত নেই। বিশ্বম্ভরবাবু উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। স্থির হয়, অবিলম্বে লাঙ্গুলের কলঙ্ক থেকে তাকে মুক্ত করা হবে এবং লাঙ্গুল মোচন করবেন স্বয়ং বিশ্বম্ভরবাবু। বাঁদর যেন তাঁরই কাছে চিরকৃতজ্ঞ হয়ে থাকে।

কিন্তু হায়, লাঙ্গুল থেকে এত বিপত্তি হবে কে জানত! কিংবা রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডের কথা স্মরণ থাকলে কে না জানত! আয়োজনের কোন ক্রটিই হয়নি। ছুরি, কাঁচি, তুলো, তোয়ালে, আয়োডিন ইত্যাদি সবই মজুত। কদিন থেকে বাঁদর বেচারা যেরকম শান্ত-শিষ্টের মত কাত হয়ে কাটাচ্ছিল তাতে মনে হয়েছিল কৃতজ্ঞ-চিত্তেই সে নিজের কলঙ্কমোচনে সায় দেবে, বিশেষ করে কড়া ক্লোরোফর্ম সেবনের পর।

তার বদলে হতভাগা ল্যাজে হাত দিতেই লাফ দিয়ে উঠে এমন কামড় দিলে—আর দিলে কিনা স্বয়ং বিশ্বম্ভরবাবুকে!

হুলুস্থুল কাণ্ড বেধে গেল তৎক্ষণাৎ। বাঁদরের বদলে তুলো, তোয়ালে, আয়োডিন বিশ্বম্ভরবাবুর কাজেই লেগে গেল। ঘা ধুইয়ে আমরা তাঁকে ভেতরে পাঠিয়ে দিলাম আর অকৃতজ্ঞ বাঁদরটাকে শেকল খুলে রাস্তায়।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের সেইখানেই শেষ নয়। পরের দিন খবর নিতে

গিয়ে দেখি, বিশ্বম্ভরবাবু বেশ বদলে গেছেন। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আর যেন তাঁর গা নেই। কোথায় গেল চা আর জল-খাবার! অনেকক্ষণ বসে থেকে তার কোন চিহ্নই দেখতে পেলাম না। একটা বাঁদর নেমকহারাম হলেও সব বাঁদর তেমন নয় বলে, আরেকটা বাঁদর আনিয়ে পরীক্ষা করার প্রস্তাবে তিনি যেন চটেই গেলেন। গণেশটা সহানুভূতি জানাতে গিয়ে আরো গোল বাধালো।

কিন্তু খুব সাবধান বিশ্বম্ভরবাবু! বাঁদরের দাঁতে বড় বিষ! বেশ কিছু গোলমাল হতে পারে।

বিশ্বম্ভরবাবু ভীত হয়ে উঠলেন, তাই নাকি! কী হয় বল তো?

কী না হতে পারে! গণেশ উৎসাহিত হয়ে উঠল এ প্রসঙ্গে, তার এক মাসতুতো ভাই ডাক্তার কিনা—সেপ্টিসিমিয়া, হাইড্রোফোবিয়া।

হাইড্রোফোবিয়া! বিশ্বম্ভরবাবু একটু বিমূঢ়।

হ্যাঁ হ্যাঁ, যাকে বলে জলাতঙ্ক।

জলাতঙ্ক হবে কেন? বিশ্বম্ভরবাবু বিরক্ত,—জলাতঙ্ক তো কুকুরে কামড়ালে হয়। আমায় তো বাঁদরে কামড়েছে।

ও কুকুর আর বাঁদর একই কথা। মোটমাট একটা আতঙ্ক কিছু হবেই—গণেশ তাঁকে আশ্বাসের সুরে বললে, জলাতঙ্ক না হয় স্থলাতঙ্ক।

স্থলাতঙ্ক আবার কী! বিশ্বম্ভরবাবু বিহ্বল।

ঐ জলাতঙ্কেরই ভায়রাভাই। কুকুর জল পছন্দ করে না, তাই কুকুরে কামড়ালে হয় জলাতঙ্ক, আর বাঁদর গাছে থাকে তাই বাঁদরে কামড়ালে—স্থলাতঙ্ক।

তাহলে উপায়? বিশ্বম্ভরবাবু শঙ্কিত।

উপায় বলতে গেলে নেই। গণেশের স্বর সান্ত্বনায় স্নিগ্ধ:

জলাতঙ্কের ইনজেকশান বেরিয়েছে, কিন্তু স্থলাতঙ্কের ওষুধ তো নেই।

ওষুধ নেই! বিশ্বম্ভরবাবু প্রায় মূর্ছিত।

তবে, এক কাজ করতে পারেন। স্থল পরিত্যাগ করতে পারেন একেবারে। স্থলে না থাকলে তো আর স্থলের আতঙ্ক হতে পারে না! গণেশ নিজের অনুপ্রেরণায় উল্লসিত হয়ে উঠল।

কিন্তু কোথায় থাকব তাহলে? বিশ্বম্ভরবাবু স্তম্ভিত।

কোথায় আবার, জলে! গণেশ সোৎসাহে জানালে। খানিক অন্যমনস্কভাবে চুপ করে থেকে বিশ্বম্ভরবাবু বললেন, আচ্ছা, ভেবে দেখি। আপনারা তাহলে আসুন।

চা ও জলখাবার তখনো এসে না পড়ায় আমরা আরো খানিকক্ষণ তাঁকে সান্ত্বনা দিতে প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু এরকম স্পষ্ট জবাবের পর বসে থাকা যায় কি?

তারপর আর কিছুই খবর নেই। বিশ্বম্ভরবাবু আহাম্মক গণেশটার কথা ওভাবে গ্রহণ করবেন কে ভেবেছিল! সেই থেকে স্থলাতঙ্কের ভয়ে তিনি জাহাজে জাহাজে পৃথিবী টুর করে বেড়াচ্ছেন। জাহাজ থেকে ডাঙায় পর্যন্ত নামেন না। বিবর্তনবাদ সম্পর্কে তাঁর যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক গবেষণা আর শেষ হয়নি। আমাদের বৈঠকও ভেঙে গেছে।

শুশুকের স্যাঙাৎ

—ওরে ভোঁদড় ফিরে চা···

কিন্তু ভোঁদড় ফিরবে কী করে? খোকার নাচন দেখে তো আর তার পেট ভরবে না! তার এখন পেয়েছে ক্ষিদে। এখন কি আর নাচন দেখা যায়, তা খোকার ক্ষুদে-ক্ষুদে পায়ের নাচন যত মিষ্টিই হোক!

ভোঁদড়ের ক্ষিদে অবশ্য রাক্ষুসে। অরুচি কাকে বলে সে জানে না। খেতে পেয়ে সে না বলেছে, এ কথা অতি বড় শত্তুর যে ভাম, সেও বলবে না।

ভামের মুখে ভোঁদড়ের নিন্দে লেগেই আছে, ভোঁদড়ের ছুটো কেচ্ছার কথা না বলে ভাম হাই পর্যন্ত তোলে না।

—আরে, ওটা আবার জানোয়ার নাকি! চারটে পা আছে বলে ভোঁদড় যদি জানোয়ার হয়, দাঁতের জোরে বরাও তাহলে হাতি!

কখনও বা গোঁফের ফাঁক দিয়ে ফ্যাস করে হেঁচে ভাম বলে, আরে ছোঃ, আঁশটে গন্ধে ত্রিসীমানায় যাওয়া যায় না—ও শুশুকের স্যাঙাতের ডাঙায় আবার কিসের খাতির! গায়ে আঁশের বদলে লোম কেন হল তাই ভাবি!

এসব নিন্দে অপমান ভোঁদড়ের কানে যায় না এমন নয়, জঙ্গলে কান-ভাঙানির তো অভাব নেই! জলের ইজারা ভাগাভাগি করে নিতে হয় বলে সিড়িঙ্গে বকের আক্রোশটা কিছু বেশি ভোঁদড়ের ওপর। ভামের সঙ্গে দাঁতাদাঁতি হয়ে তার ভালোমন্দ কিছু হলে বকের আশা মেটে। সুবিধে পেলেই তাই সে রঙ ফলিয়ে ভামের গালাগালগুলো ভোঁদড়কে শোনাতে ছাড়ে না।

জলের ধারে ধ্যানস্থ হয়ে হয়ত সে বসে আছে, নজর আছে গুড়জাওয়ালি ছা-টার ওপর। এমন মিঠে মাছ বহুদিন তার ঠোঁটে পড়েনি, একবার নাগাল পেলে হয়! হঠাৎ জলের ওপর একটা ঢেউ দেখা গেল। তারপর খানিকটা তোলপাড়। জলের ভেতর সাদা একটা বিদ্যুৎ যেন খেলে বেড়াচ্ছে। কিন্তু সে আর কতক্ষণ! হঠাৎ জল ফাঁক করে গোঁফ-সমেত একটা থ্যাবড়া মুখ বেরোলো। গুড়জাওয়ালির ছা ধরা পড়েছে।

এমন ঠোঁটের গ্রাস ফসকালে হাড়-পিত্তি পর্যন্ত জ্বলে ওঠে কি না? কিন্তু সিড়িঙ্গের মুখ দেখে বোঝবার জো নেই কিছু। বক নয়, একেবারে পরমহংসের মত উদাসীন ভাবে বললে, কী ধরলে ওটা? গুড়জাওয়ালি বুঝি? বলে মিষ্টি মিষ্টি। আমার তো অরুচি ধরে গেছে!

গুড়জাওয়ালিটাকে এক গ্রাসে গিলে আবার ভোঁদড় জলে বুঝি নেমে যাচ্ছিল। সিড়িঙ্গে গলা-খাঁকারি দিয়ে উঠল, ক্বক্! জানো তো ভাই, এর কথা ওকে লাগানো ওর কথা একে লাগানো—এসব আমি পছন্দ করিনা মোটেও। আমি কারুর সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। হক কথা কয় বলে বকের বনে না কারুর সঙ্গে। আজ তাই বেশ করে শুনিয়ে দিয়ে এসেছি···

ভোঁদড় গলা-খাঁকারি শুনে একবার ফিরে তাকিয়েছিল। কিন্তু বকের কথা শেষ না হতেই আবার জলের ভেতর একটা ডিগবাজি খেয়ে গেল তলিয়ে। এসব কথায় তার ভ্রূক্ষেপ নেই।

এমন ভনিতাটা নষ্ট হলে রাগ তো হবারই কথা!

রাগে নিশপিশ করে বক নিজের মনেই বলে, দেমাক! একেবারে ফেটে পড়ছে! ধেড়ে কুমির সেদিন গো-বাঘাটাকে ধরলে, আর এটাকে দেখতে পায়না গো!

কিন্তু মিছে রাগে তো লাভ নেই! কাদা বাঁচিয়ে গুটি-গুটি পা ফেলে সিড়িঙ্গে আবার আর-এক জায়গায় জলের ধারে গিয়ে

দাঁড়ায়। জলের ওপর ছোট ঢেউয়ের দোলা দেখে ভোঁদড় কোথায় আছে জানতে তার বাকি নেই।

খানিক বাদেই ভোঁদড় আবার জল থেকে ডাঙায় ওঠে। এবারে মুখ তার খালি।

সিড়িঙ্গে দরদের সুরে বলে, আহা, ফসকে গেল বুঝি?

ভোঁদড় গা-ঝাড়া দিয়ে জল ছিটিয়ে বলে, উঁহু, ধরব কী! খালি কুচো মাছ এখানটায়!

যা বলেছ! নদীর জল বেড়ে অবধি মাছের আর সুখ নেই! হুঁ, তখন কী যেন বলছিলুম? হ্যাঁ হ্যাঁ, ঐ হাঁড়িমুখো ভামের কথা। আস্পর্ধাটা শোনো একবার! আমায় ডেকে সেদিন বলে কি না, কী গো জেলে-মাসি, তোমাদের শুশুকের স্যাঙাতের গায়ে নাকি আঁশ বেরিয়েছে! আমিও ছেড়ে কথা কইব কেন? হাজার হলেও তোমায় আমায় এক জলে ঘর করি তো? ভামের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কিসের? বললাম তাই, আঁশ কী কাঁটা একবার শুঁকে এস না নিজে গিয়ে! সে মুরোদ তো নেই!

ভোঁদড় কিন্তু এসব কথা গায়েই মাখে না। জঙ্গলের এসব ঘোঁটঘাঁটের মধ্যে সে নেই। পেটটা ভরা থাকলেই হল। নেচে-কুঁদে, ফুর্তি করে সে দিন কাটায়। সব কথা কানে গেল কি না গেল। ডাঙায় দুবার গড়াগড়ি দিয়ে, দুটো ডিগবাজি খেয়ে সে বললে, যে যা বলে বলুক না মাসি। গালাগালিতে গায়ে তো আর ফোস্কা পড়বে না, নদীর মাছও কমে যাবে না।

তা তো বটেই, তা তো বটেই। আমিও তো তাই বলি। তবে কি জানো, ছোট মুখের বড় কথায় গা জ্বালা করে। কার ডিম, কার ছানা চুরি করে তো দিন চলে, উনি আবার নাকি বড় ঘরোয়ানা, মস্ত কুলীন! কেঁদো বাঘের কোন্ সইয়ের বোয়ের বকুলফুলের বোনঝি-জামাই বলে গুমর আর ধরে নাকো···

কিন্তু বকের ঠোঁট নাড়াই সার। ভোঁদড় তখন অনেক দূরে।

আজ ভোঁদড়ের ক্ষিদে পেয়েছে একটু বেশি। কিন্তু ক্ষিদের চেয়ে বেশি হয়েছে ভাবনা। সারাদিন নদীতে বলতে গেলে দাঁতে একটা কাঁটা কাটেনি। নদী উঠেছে ফুলে। দারুণ টান। মাছ কি উঠেছে যে ধরবে? তাই এখন ভোঁদড় চলেছে শামুকডোবায়। সেখানে মাছ ধরে সুখ নেই, খালি শোল আর চুনোপুঁটি। কিন্তু সৌখীন হবার সময় তো এ নয়!

ফি-বছর বাদলার দিনে নদী এমন বেড়ে ওঠে, কিন্তু এবারের ব্যাপার একটু আলাদা। জলের ধারে ব্যাঙের পাড়ায় সব চুপ-চাপ; সেখান থেকে মাঠে উঠে দেখে, একেবারে অবাক কাণ্ড! মেঠো ইঁদুরের দল বাচ্ছাকাচ্ছা-সমেত বাসা ছেড়ে কোথায় চলেছে।

না, আজ সেরেফ উপোস। দিনের বেলা একটা করে মেঠো ইঁদুর দেখলেই বলে দিন খারাপ যায়, আর এ একেবারে ইঁদুরের ঝাঁক!

কিন্তু ব্যাপারটা কী! মেঠো ইঁদুর সব দল বেঁধে দেশান্তরী হচ্ছে কোন্ দুঃখে? নাঃ, ভোঁদড়কে কথাটা জানাতেই হয়!

পথে যেতে সবাইকে সে জিজ্ঞাসা করে, হ্যাঁগো, ব্যাপার কী? কিন্তু মেঠো ইঁদুরের কথা কইবার ফুরসুতও যেন নেই। পড়ি-কি-মরি করে তারা ছুটেছে সব একদিকে। উত্তর কেউ দেয় না। দিলেও দাঁত খিচিয়ে বলে, আমরা মরছি নিজের জ্বালায়, উনি এসেছেন ব্যাপার শুধোতে!

লিকলিকে এক লম্বা-ল্যাজের শেষকালে বুঝি দয়া হল, আহা কে না বাপু বলে! ভোঁদড়, যাই বল বাপু, ভালমানুষের পো। আমাদের ক্ষতি কোনদিন করে না।

কথাটা শেষ পর্যন্ত ভোঁদড় শুনল। অত্যন্ত ভাবনার কথা! কিন্তু মেঠো ইঁদুরের ভুলও তো কখনো হয় না।

শালুক-ডোবায় যাওয়া এখন থাক। ভোঁদড়কে তাড়াতাড়ি

জঙ্গলে গিয়ে খবরটা দিতেই হয়। এইবেলা বাসা-টাসা না সামলালে আর সময় হবে না।

কিন্তু খবর দেওয়া আর হল না। খানিক দূর যেতেই সজারুর সঙ্গে দেখা। গায়ে কাঁটা হলে কী হবে, মনটা একেবারে সাদা। নেহাত ভালোমানুষ।

বার-দুয়েক নাকের আওয়াজ করে অত্যন্ত 'কিন্তু' হয়ে বললে, তোমার কাছেই আসছিলাম। ওরা পাঠালে ভাই।

কেন বল তো ?

সজারু প্রথমটা বলতেই চায় না। তারপর অনেক কষ্টে তার কাছ থেকে ব্যাপারটা জানা গেল। জঙ্গলের ছোট দলের আজ পঞ্চায়েত বসেছে। ভোঁদড়কে একঘরে করা উচিত কি না তারই বিচার হবে।

কেন, অপরাধটা কী ?

কী জানি ভাই, ঘোঁটটা ভালোই পাকিয়েছে বকের সঙ্গে জোট করে। জল না ছাড়লে তোমায় নাকি ডাঙায় আমল দেওয়া হবে না।

ভোঁদড়ের চোখদুটো রাগে চকচক করে উঠল। গোঁফটা উঠল ফুলে। বটে ! আচ্ছা, চল যাচ্ছি।

কাঁটানটের জঙ্গলের খেজুর গাছের কোলে আসর বসেছে মস্ত। বনের হোমরা-চোমরা বাঘ ভাল্লুক বাদে আসতে আর কারুর বাকি নেই। ধেড়ে কুমির সভাপতি। খেজুর-গুঁড়িটায় ঠেস দিয়ে বসেছে সে।

ভোঁদড় যেতেই বেশ একটু সোরগোল উঠে থেমে গেল। চুপ, চুপ ! ভাম অনেকক্ষণ ধরে তৈরি হয়ে আছে। দাঁড়িয়ে উঠে এবার বললে,

জঙ্গলী ভাই সব ! তারপর একটু থেমে বললে, তোমাদের সকলকে ভাই বলতে পারলে আমি খুশি হতাম, কিন্তু অত্যন্ত

দুঃখের বিষয় আমার তা বলার উপায় নেই। আমাদের ভেতর এমন অনেক আছে যাদের ভাই বললে জঙ্গলের অপমান করা হয়। তারা জলেরও নয়, জঙ্গলেরও নয়···

একজন চাপা গলায় বললে, আমাদের সভাপতিটি কি?

মাটিতে ল্যাজের এক প্রচণ্ড বাড়ি মেরে কুমির চার পায়ে ভর দিয়ে খাড়া হয়ে উঠল।

সবাই একেবারে থ! সভা বুঝি এইখানেই পণ্ড হয়! খ্যাঁক-শিয়ালি অনেক কষ্টে সভাপতিকে ঠাণ্ডা করলে।

যত সব চ্যাংড়ার কাণ্ড! আপনার কি ওসব কথায় কান দিতে আছে?

কোন রকমে আবার সভা শান্ত হল। ভামের বক্তৃতা চলল।

একটানা, একঘেয়ে বক্তৃতা। সভাপতির পর্যন্ত হাই উঠছে। শেষকালে খ্যাঁকশিয়ালি গিয়ে ভামের কানে-কানে কি বলতে তবে সে থামে। তার আসল কথাটা তখন কি-ভাগ্যি বলা হয়েছে! আসল কথা আর কিছু নয়, ভোঁদড় যদি জল না ছাড়ে তাহলে ডাঙায় তাকে একঘরে করা হবে।

সজারু হঠাৎ ভালোমানুষের মত বলে ফেললে, ভোঁদড় তো জল ছাড়বে, কিন্তু ঘোঁটের সর্দার বক? তার বেলা কী হবে?

বক এতক্ষণ মাথা গুঁজে চোখ বুজে চুপটি করে বক্তৃতা শুনছিল। এবার চট্ করে গলা বাড়িয়ে পাখার ঝাপটা দিয়ে খাড়া হয়ে উঠল।

হ্যাঁ, বকের পেছনে না লাগলে সুখ হবে কেন! বকের দোষটা কোন্‌খানে শুনি? ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় আমার নেই তো! জলের মাছ ধরে খাই, সে কথা দেশে দেশে, দশে দশে জানে। কিন্তু বলুক দিখিনি কেউ কখনো দেখেছে গা ডুবিয়েছি জলে? তার আগে যেন গায়ে আঁশ বেরোয়! আমি তো আর পানকৌটি নই, ভোঁদড়ও নই!

সভাপতি ল্যাজ-ঝাপটা দিয়ে বললে, চুপ, চুপ! ভোঁদড়ের এখন কী বলবার আছে শোনা যাক।

ভোঁদড় এতক্ষণ বক্তৃতা কিছু শোনেনি বললেই হয়। সে কান খাড়া করে ছিল অন্য কিছুর আশায়।

এবার সে উঠে সবাইকে অবাক করে দিলে—ভাইসব, তোমরা, আমাকে জল না ডাঙা দুটোর একটা বেছে নিতে বলেছ। কিন্তু তার আগে আমিই তোমাদের সেই প্রশ্ন করছি। জল না ডাঙা, কী তোমরা বেছে নিতে চাও?

সবাই একেবারে হতভম্ব! খ্যাঁকশিয়ালি সবার আগে বুঝি নিজেকে সামলে নিয়ে খেঁকিয়ে উঠল, ভাঁড়ামি করবার বুঝি আর জায়গা পাওনি, না?

ভোঁদড় গম্ভীরভাবে বললে, বাজে তর্ক করবার সময় আমার নেই। তোমাদের জবাব আমি চাই।

ভামের গোঁফ রাগে ফুলে উঠল, খ্যাঁকশিয়ালির ল্যাজ খাড়া হয়ে উঠেছে। রক্তারক্তি কাণ্ড বুঝি এখানেই বাধে!

ভোঁদড় তবু শান্তভাবে বললে, ডাঙা যদি চাও তো জেনো, আর সময় নেই।

এবার সবাই যেন একটু ভয় পেয়েছে মনে হল।

হঠাৎ খরগোসের দল চনমন করে উঠল। তারা শুনতে পেয়েছে। দূর থেকে কিসের ভয়ঙ্কর আওয়াজ!

দেখতে দেখতে সবারই কান খাড়া হয়ে উঠল। সবাই সরে পড়বার জন্যে ব্যস্ত।

বক পাখা নেড়ে সবাইকে ঠাণ্ডা করবার চেষ্টা করলে—কিছু নয়, ভয় পাবার কিছু নেই। এ শুধু সবাইকে বোকা বানাবার ফিকির ভোঁদড়ের।

কিন্তু কে কার কথা শোনে! আওয়াজ এবার আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

খরগোসের দল আগেই সরতে আরম্ভ করেছে। খ্যাঁকশিয়ালি ল্যাজ গুটিয়ে পাশ কাটাচ্ছে।

সভা ছত্রভঙ্গ। ভাম পর্যন্ত ছটফট করছে পালাবার জন্যে। সিড়িঙ্গে বকের চোখেই যা লজ্জা।

কিন্তু সে লজ্জাও আর বেশিক্ষণ রইল না। এবার আর বুঝতে কিছু বাকি নেই। জলের ভয়ঙ্কর আওয়াজ। নদীতে বান আসছে জঙ্গল ভাসিয়ে। ভাম তিন লাফে কাঁটানটের জঙ্গল পার হয়ে একেবারে দূরের মাদার গাছের আগডালে।

পেছন থেকে ভোঁদড় চিৎকার করে বললে, আহা, চললে কোথায়? শুশুকের স্যাঙাতের জবাবটা দিয়ে গেলে না?

হার্মাদ

আজকের কথা নয়, ইংরেজ রাজত্বের তখনও শুরু হয়নি। মুসলমানদের রাজপ্রতাপ অস্তে যায়-যায় হয়েছে। দেশময় গোল। যে-যার পারে লুট করে খায়—দেশে না আছে শাসন, না আছে শান্তি। তখনকার কথা বলছি।

কর্ণফুলি নদীর ধারে মাঝারি একটি গ্রাম। নাম রঙ্গনা।

রঙ্গনার লোক সবাই সেদিন নদীর ধারে ভেঙে পড়েছে। রঙ্গনার সবচেয়ে ধনী সদাগর উজ্জ্বল সাধু তিন ছেলে নিয়ে বাণিজ্যে যাবেন। সাত-সাতটা ডিঙা নদীর ধারে সেজেছে। তার কোনটা ময়ূরপঙ্খী, কোনটা মকরমুখী, কোনটার মাথায় পরীর মূর্তি, কোনটার বা রাজহাঁসের।

বাণিজ্যে যাওয়া তখন সোজা নয়। জলপথে একবার গেলে ফেরবার আশা কম। জল-ঝড় তো আছেই, তার ওপর জলদস্যুর উৎপাত। উজ্জ্বল সাধুকে গাঁয়ের লোক অনেক নিষেধ করেছে কিন্তু উজ্জ্বল সাধু চিরদিন একরোখা—ভয়-ডর বলে কিছু জানেন না। তিনি কারুর কথা শোনেন নি, তিনি বলেছেন—সদাগরের বংশ আমরা, সাত সমুদ্দুর চষে বেড়ানোই আমাদের জাত-ব্যবসা। আমাদের কি ভয়-ডর করলে চলে?

ডিঙা প্রস্তুত, সাজগোজ সব শেষ। বাড়ির মেয়েদের পান-গুপারি দূর্বা-চন্দন দিয়ে নৌকো বরণ করা হয়ে গেছে। মাঝিরা দাঁড়ে বসেছে।

উজ্জ্বল সাধু তাঁর ময়ূরপঙ্খীতে উঠে নোঙর তোলবার আদেশ দিতে যাবেন, এমন সময় তাঁর মনে হল, ছোট ছেলে বসন্তকে তো দেখা যায়নি অনেকক্ষণ!

উজ্জ্বল সদাগরের তিন ছেলে—রূপকুমার, কাঞ্চনকুমার আর বসন্তকুমার।

লোকে বলত তিনটি ছেলে রূপে গুণে যেন তিনটি রত্ন; কিন্তু উজ্জ্বল সাধু ভুরু কুঁচকে বলতেন, উঁহু, বসন্তটা ষাঁড়ের গোবর!

বসন্তকে পছন্দ না করবার তাঁর কারণ ছিল। রূপকুমার কাঞ্চনকুমার, বাপের মত, যেমন জোয়ান তেমনি সাহসী। কোন্ বিদেশে গিয়ে কেমন করে বাণিজ্য করবে, এই হল তাদের সারাক্ষণ চিন্তা; আর বসন্ত এসবের বিপরীত—সদাগরের ছেলে হয়ে সে রাতদিন পুঁথিপত্র নিয়েই ব্যস্ত। দেখতে নেহাৎ দুর্বল, রোগা সে নয় বটে, কিন্তু দাদাদের মত লম্বা-চওড়া চেহারাও তার নয়। মাথাটি তার বামুন-পণ্ডিতের মত মুড়োনো; তার মাঝখানে মস্ত বড় এক টিকি।

উজ্জ্বল সাধু রাগ করে বলতেন, তালপাতার পুঁথি পড়ে-পড়ে ও টিকি একদিন তালগাছ হবে দেখিস!

ভায়েরাও বাবার দেখাদেখি তাকে ঠাট্টা করতে ছাড়ত না। ছোট ভাইকে তারা বিশেষ পছন্দ করে না। কিন্তু বসন্তর তাতে ভ্রূক্ষেপ ছিল না।

বরাবর রূপ আর কাঞ্চনই বাপের সঙ্গে বিদেশে যায়। এবারে উজ্জ্বল সাধু জোর করে বসন্তকে সঙ্গে নিয়ে চলেছেন—বিদেশ-টিদেশ ঘুরে যদি তার পুঁথি পড়ার ব্যারাম সারানো যায় এই আশায়।

ছোট ছেলেকে এখন না দেখতে পেয়ে তিনি বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় গেল বসন্ত?

কেউ তা জানেনা। চারিদিকে খোঁজ-খোঁজ পড়ে গেল। কিন্তু বসন্তকে পাওয়া গেল না। কোন ডিঙাতেই সে ওঠেনি।

নৌকো ছাড়তে দেরি হয়ে যাচ্ছে। উজ্জ্বল সাধু রেগেই খুন, বললেন, সে নিশ্চয়ই বিদেশে যাবার ভয়ে কোথায় পালিয়েছে।

লোকজনকে ডেকে বললেন, যেখানে আছে, যেমন করে পারো খুঁজে পিছমোড়া করে বেঁধে নিয়ে এস। আমার ছেলে এমন ভিতু —ছিছি! আমার মুখ দেখাতে লজ্জা করছে যে!

কিন্তু বসন্ত পালায় নি। লোকজন নৌকো থেকে নেমে খুঁজতে যাবে, এমন সময় দেখা গেল বগলে ছুটো পুঁটলি. নিয়ে দৌড়তে দৌড়তে সে আসছে।

উজ্জ্বল সাধু ধমক দিয়ে বললেন, কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

বসন্ত মাথা নিচু করে বললে, আজ্ঞে, একটা পুঁথি খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

পুঁথি! বাণিজ্যে যাবি তো তোর পুঁথির কী দরকার?

রূপকুমার, কাঞ্চনকুমার, নৌকোর সব লোক হেসে ওঠল।

বসন্তর মুখে আর কথা নেই।

উজ্জ্বল সাধু বললেন, কী আছে তোর পুঁটলিতে? খোল্ দেখি!

কী আর করে! বসন্ত ধীরে ধীরে পুঁটলি-ছুটি খুললে। পুঁটলির ভেতর একরাশ পুঁথি।

উজ্জ্বল সাধুর আর সহ্য হল না। দাঁড়া, তোর পুঁথি পড়া আমি বার করছি! বলে ছুটি পুঁটলি তিনি ছুঁড়ে নদীতে ফেলে দিয়ে হাঁকলেন, তোল নোঙর।

বসন্ত চম্‌কে চিৎকার করে উঠে হতভম্ব হয়ে জলের দিকে তাকিয়ে রইল। নৌকোর লোকে সবাই হেসে উঠল।

হালকা তালপাতার পুঁথি, জলে পড়েও তা ডোবেনি। বসন্তর মনে হল, এখনো জলে নেমে সেগুলো তুলে আনা যায়। কিন্তু উপায় নেই, নোঙর তুলে ডিঙার সার তখন এগোতে শুরু করেছে।

নানা দেশ, নানা বন্দর হয়ে ডিঙা যায়। কিন্তু বসন্তর মনে সুখ নেই। শুধু পুঁথির শোকেই যে সে বিষণ্ণ তা নয়, নৌকোর কেউ তাকে আমল দিচ্ছে না, দাদারা সব সময়ে তাকে নিয়ে ঠাট্টা করে। এও তার বড় দুঃখ।

বসন্ত নৌকোর হালের কাছে গিয়ে বসে হয়ত বলে, দাও না শ্রীধর, আমি একটু হাল ধরি!

শ্রীধর মাঝি একটু হেসে বলে, এ কি আপনার কাজ, ছোটকর্তা!

বসন্ত তবু জেদ করে বলে, না না। আমি তোমার দেখে দেখে শিখেছি যে!

শ্রীধর গম্ভীর হয়ে বলে, না না ছোটকর্তা, তা কি হয়? শেষকালে নৌকো সামলানো দায় হবে।

রূপ আর কাঞ্চন তো সুবিধে পেলে বসন্তকে অপ্রস্তুত করতে ছাড়েই না।

মাঝরাতে বসন্ত ঘুমিয়ে আছে। হঠাৎ দুভাই শশব্যস্তে এসে তাকে ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে বলে, ওঠ্, ওঠ্ শিগগির! ডিঙায় হার্মাদ আসছে!

হার্মাদের নাম শুনে বসন্ত ধড়মড় করে উঠে বসে। হার্মাদ চোখে এখনো দেখেনি, কিন্তু মাঝিমাল্লা সকলের কাছে এই বিদেশী জলদস্যুর নির্মমতার কাহিনী শুনে শুনে তাদের সম্বন্ধে তার ধারণা আর অস্পষ্ট নেই। বাঘের চেয়ে হিংস্র, সাপের চেয়েও খল, এই মানুষের চেহারার পিশাচেরা যেখান নামে সেখানে কী সর্বনাশই যে করে তা স্মরণ করে শিউরে উঠে বসন্ত বলে, কী করব দাদা!

রূপ আর কাঞ্চন তার হাতে একটা বল্লম গুঁজে দিয়ে বলে, তুই চুপি-চুপি ওপরে উঠে গিয়ে মাঝিদের সব জাগিয়ে দিগে যা, আমরা নিচে থেকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যাচ্ছি। যা তাড়াতাড়ি যা, হার্মাদদের স্লুপ এসে পড়ল বলে, আমরা দূর থেকে আলো দেখে নেমে এসেছি।

ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বসন্ত বল্লম হাতে নৌকোর খোল থেকে ওপরে উঠে যায় অন্ধকার রাতে। নদীতে নোঙর ফেলে নৌকোর

পাটাতনের ওপর যে-যার জায়গায় মাঝিরা ঘুমোচ্ছে, শুধু হালের কাছে একজন প্রহরী পাহারায় দাঁড়িয়ে।

বসন্ত সামনে যাকে পায় প্রাণপণে ঠেলা দিয়ে বলে, ওঠ ওঠ, হার্মাদ আসছে!

হার্মাদের নাম শুনে সে এবং আরো দু-একজন ধড়মড় করে উঠে পড়ে। তারপর এদিক-ওদিক চেয়ে একজন হেসে উঠে বলে, কে, ছোটকর্তা নাকি? তাই তো ভাবি এত রাত্রে হার্মাদ এল কোথা থেকে? তা, আসুক না হার্মাদ! আপনার ভয় নেই, আমরা আছি। আপনি ঘুমোন গে যান।

বসন্ত উত্তেজিত হয়ে বলে, কী বাজে বকছ! হার্মাদদের সুলুপের আলো দেখা গেছে, শিগগির ওঠো সব!

মাঝিরা সবাই এবার হেসে ওঠে। একজন বলে, হার্মাদরা আপনার বল্লম দেখে পালিয়েছে কর্তা! এ রাত্রে আর আসবে না।

বসন্ত আরো কিছু বলত হয়ত, কিন্তু পেছনে হাসির শব্দ শুনে দেখে, রূপ ও কাঞ্চন হাসির চোটে পরস্পরের গায়ে ঢলে পড়ছে।

এইবার সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে অত্যন্ত অপ্রতিভ হয়ে বসন্ত মাথা নিচু করে নিচে চলে যায়।

একদিন কিন্তু রূপ আর কাঞ্চনের ঠাট্টা সত্যি হয়ে উঠবে কে জানত! সদাগরের বাণিজ্য শেষ হয়েছে! সাতটি ডিঙা নানা বন্দর নানা দেশ ঘুরে দেশের মুখে চলেছে। দিন-দশেক বাদেই দেশে ফিরতে পাবে জেনে মাঝিদের আর আনন্দের সীমা নেই। কর্ণফুলির মুখে হার্মাদদের ভয়—সে উজানটেক নির্বিঘ্নে পার হয়ে এসে তাদের আশা ও সাহস বেড়ে গেছে। সকলেরই ধারণা, এ-দফায় আর বিপদ ঘটবে না। এমন সময় একদিন দুপুরবেলা বিনা মেঘে বজ্রপাত হল।

বিস্তীর্ণ নদী, এপার থেকে ওপার দেখা যায় না। তারই মাঝখান দিয়ে সদাগরের সাত ডিঙা চলেছে। হঠাৎ সামনের মকরমুখো ডিঙার দাঁড় টানা বন্ধ হয়ে গেল। মকরমুখো থেকে কে হেঁকে বললে, খবরদার, সামনে লুট হচ্ছে! সব নৌকোর মাঝিমাল্লা উদ্‌গ্রীব হয়ে ছুটে এল। দেখা গেল, সামনে কোন হতভাগ্য সদাগরের তিনটি নৌকোয় আগুন ধরেছে। নদীর মাঝখানে সেই তিনটি জ্বলন্ত নৌকো থেকে অসহায় মাঝিমাল্লা প্রাণ বাঁচাবার জন্যে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। কিন্তু জলে পড়েও তাদের নিস্তার নেই। পাঁচ-পাঁচটি জলদস্যুদের সুলুপ থেকে জলের লোকদের ওপর নির্মম-ভাবে হার্মাদরা তীর ছুঁড়ছে।

উজ্জ্বল সাধুর সাতডিঙায় সোরগোল পড়ে গেল। উজ্জ্বল সাধু পাগলের মত ছুটোছুটি করে বেড়াতে বেড়াতে মাঝিদের নৌকোর মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে যাবার ব্যবস্থা বলে দিতে লাগলেন। নৌকোর খোল থেকে অস্ত্রশস্ত্র সব ওপরে এনে মাঝিদের মাঝে ভাগ করে দেওয়া হল। তারপর নৌকোর মুখ ফিরিয়ে প্রাণপণে সবাই দাঁড় টানতে লেগে গেল। হার্মাদরা অনুসরণ শুরু করবার আগে কিছুদূর এগিয়ে যেতে পারলে হয়ত এযাত্রা রক্ষা পাওয়াও যেতে পারে।

কিন্তু তা হবার নয়। হঠাৎ সমস্ত নদী কাঁপিয়ে বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল। হার্মাদরা এবারে আক্রমণ করার আয়োজন করছে। উজ্জ্বল সদাগর চিৎকার করে বললেন, প্রাণপণে দাঁড় টানো মাঝিরা সব, এ-যাত্রা বাঁচলে সবাই ডবল মাহিনা পাবে!

কিন্তু মাঝিদের কোন পুরস্কারের লোভ দেখাবার দরকার ছিল না। তারা প্রাণের দায়ে তখন সমস্ত শক্তি দিয়ে দাঁড় টানছে। হার্মাদদের সুলুপগুলি তখন একসার হয়ে অনুসরণ আরম্ভ করেছে।

বহুদূর পর্যন্ত এইভাবে অনুসরণ চলল। হার্মাদের নৌকোগুলি তখনও সমানে পেছনে আসছে। কিন্তু মাঝিরা কতক্ষণ এক

নাগাড়ে প্রাণপণে টানতে পারে। হার্মাদদের নৌকোয় লোকবল অনেক বেশি। ধীরে ধীরে দেখা গেল তারা এগিয়ে আসছে।

সন্ধ্যার কাছাকাছি আর তাদের এড়ানো গেল না। তারা প্রায় পঞ্চাশ গজের মধ্যে এসে পড়েছে। সদাগরের সাত ডিঙার ওপর তারা সেকালের গাদা বন্দুক ছুঁড়তে শুরু করল। সদাগরের ডিঙায় মাত্র একটি বন্দুক। উজ্জ্বল সাধু নিজে সেই বন্দুক ছুঁড়ে তাদের গুলির জবাব দিলেন। কিন্তু এমন করে আর কতক্ষণ চালানো যায়? দেখতে-দেখতে বড়-বড় মশাল জ্বেলে হার্মাদরা তাদের সুলুপগুলি একেবারে সদাগরের সাত ডিঙার মাঝখানে নিয়ে এসে ফেলল, এবং বড়-বড় কাছি দিয়ে সদাগরের ডিঙাগুলির সঙ্গে তাদের সুলুপ শক্ত করে বেঁধে তরোয়াল ও বন্দুক নিয়ে নৌকোর ওপর লাফিয়ে পড়ল।

এইবার যে-ব্যাপার শুরু হল তার আর বর্ণনা হয় না। তখনও ভালো করে সন্ধ্যা হয়নি। আকাশের আবছা আলোয় কিছুদূর পর্যন্ত দেখা যায়, কিন্তু হার্মাদদের মশালের আলোয় চোখে এমন ধাঁধা লাগে যে অন্ধকার আরো গাঢ় বলে মনে হয়। সেই অস্পষ্ট অন্ধকারে মশালের লাল আলোয় বিস্তীর্ণ নদীর ওপর অসংখ্য মানুষের চিৎকার, তরোয়ালের সঙ্গে তরোয়ালের ঝঞ্চনা, বন্দুকের আওয়াজ মিলে এক ভয়ঙ্কর জগৎ সৃষ্টি করে তুলল। হার্মাদদের বিশাল যমদূতের মত চেহারা, গায়ে তাদের লাল কোর্তা, মাথায় কারো কালো টুপি কারো কাপড় দিয়ে আঁট করে চুল পেছনে টেনে বাঁধা, পরনে তাদের রক্তাভ পেণ্টুলেন। সংখ্যায় তারা যেমন বেশি, অস্ত্রশস্ত্রও তাদের তেমনি জবর—তাদের অধিকাংশের কাছেই বন্দুক ও পিস্তল। হাতাহাতি লড়াইয়ে আপাতত সে বারুদ-গাদা পিস্তল ছোঁড়ার বিশেষ সুবিধে না হলেও সদাগরের ডিঙার লোকেরা তাদের হিংস্র আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারছিল না, দলে-দলে ডিঙার লোক মারা পড়ছিল। দেখতে দেখতে

সদাগরের মকরমুখো ডিঙায় হার্মাদরা আগুন ধরিয়ে দিলে। নদীর জল সে-আলোয় লাল হয়ে উঠল। উজ্জ্বল সাধু এবার বন্দুক ফেলে উন্মত্ত হয়ে তরোয়াল নিয়ে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গেলেন, কিন্তু শ্রীধর মাঝি, রূপ ও কাঞ্চন মিলে তাঁকে জোর করে ধরে রাখল। শ্রীধর বললে, আর যুদ্ধ করে লাভ কী বলুন? এবার আত্মসমর্পণ না করে আর উপায় নেই!

কিন্তু উজ্জ্বল সাধু আত্মসমর্পণ করতে কিছুতেই রাজি নন—হার্মাদের হাতে ক্রীতদাস রূপে বন্দী হওয়ার চেয়ে যুদ্ধে মরাই ভালো বলে তিনি তাদের হাত ছেড়ে দিতে বললেন। শ্রীধর তবু বুঝিয়ে তাঁকে ধরে রাখবার চেষ্টা করছিল, এমন সময়ে দুজন হার্মাদ হঠাৎ সেদিকে এগিয়ে এসে তাদের আক্রমণ করলে। রূপ বন্দুকটা তুলতে গিয়ে দেখে বন্দুক নেই—কখন কে সরিয়ে নিয়েছে কেউ দেখেনি। শ্রীধর ও উজ্জ্বল সাধু তরোয়াল তুলে ধরলেন। উজ্জ্বল সাধুর তরোয়ালের ঘায়ে একজন হার্মাদের হাতের অসি পড়ে গেল কিন্তু আর-একজন এক ঘায়ে শ্রীধরকে অস্ত্রচ্যুত করে উজ্জ্বল সাধুর মাথার ওপর তরোয়াল উঁচিয়ে ধরল। হঠাৎ গুড়ুম করে এক শব্দ। হার্মাদের হাতের তরোয়াল হাতেই রয়ে গেল, কাটা কলাগাছের মত সে ডিঙার ওপর পড়ে গেল। আরেকজন হার্মাদ তখন মাটি থেকে একটা বল্লম তুলে নিয়ে উজ্জ্বল সাধুর বুক লক্ষ্য করে ছোঁড়বার উদ্যোগ করছে। কিন্তু তারও হাতের বল্লম হাত থেকে আর ছুটল না—আবার এক বন্দুকের আওয়াজের সঙ্গে সে লুটিয়ে পড়ল।

উজ্জ্বল সাধু অবাক হয়ে চারিদিকে চেয়ে দেখলেন—কোথা থেকে কে বন্দুক ছুঁড়ছে কিছুই দেখা যায় না। বেশিক্ষণ অবশ্য খোঁজবার সময়ও তাঁর রইল না। হার্মাদরা এইবার চারিদিক থেকে এসে তাঁদের ছেঁকে ধরলে। সদাগর মরিয়া হয়ে লড়বার

জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন এমন সময় শ্রীধর জোর করে একটা সাদা নিশান তুলে দোলাতে লাগল।

সাদা নিশান মানে সন্ধি, কিন্তু হার্মাদের কাছে সাদা নিশান মানে আত্মসমর্পণ। সাদা নিশান দেখবামাত্র অন্য সমস্ত ডিঙাতেও যুদ্ধ থেমে গেল। হার্মাদরা এইবার এগিয়ে এসে দড়ি দিয়ে শক্ত করে সকলকে বেঁধে ফেলতে লাগল। উপায়হীন হয়ে উজ্জ্বল সাধু হাত বাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু যে হার্মাদ তাঁকে বাধতে এসেছিল, হঠাৎ আর একটা বন্দুকের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে সে পড়ে গেল।

সাদা নিশানের পরও বন্দুক ছোঁড়ে কে? সবাই কৌতূহলী হয়ে চারিদিকে চেয়ে হঠাৎ দেখতে পেল, নৌকোর মাস্তুলের একেবারে আগায় পা ঝুলিয়ে একজন বন্দুক নিয়ে বসে আছে। একজন হার্মাদ তার দিকে পিস্তল উঁচিয়ে ধরতেই মাস্তুল থেকে আবার এক আওয়াজ হল। হার্মাদের পিস্তল ছোঁড়া জীবনের মত শেষ হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

সাদা নিশানের পরও এরকম বন্দুক ছোঁড়ায় হার্মাদরা একেবারে ক্ষেপে উঠল। তারা সবাই সেইদিকে বন্দুক উঁচিয়ে তাকে গুলি করবার উদ্যোগ করছে, এমন সময় হার্মাদদের সর্দার গঞ্জালেস এগিয়ে এসে হাত নেড়ে বললে,—থামো, গুলি করে মারলে ওর অপরাধের উচিত শাস্তি হবে না! ওকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মেরে আমি কুকুর দিয়ে খাওয়াব! ওকে জীবন্ত নামিয়ে দিয়ে আসতে হবে।

তিন তিনজন হার্মাদ তৎক্ষণাৎ মাস্তুল বেয়ে ওপরে উঠতে গেল, কিন্তু বেশিদূর তাদের উঠতে হল না। এক এক করে তিনজনেরই মৃতদেহ মাস্তুলের তলায় লুটিয়ে পড়ল। আরও তিনজন তারপর মাস্তুলে উঠতে গিয়ে সেই দশাই প্রাপ্ত হল। গঞ্জালেস উন্মত্ত হয়ে বললে, মাস্তুল কুড়ুল দিয়ে কেটে ফেল! মাস্তুলের তলায় তৎক্ষণাৎ হার্মাদরা কুড়ুল নিয়ে এসে কোপ

দিতে শুরু করলে। দেখতে দেখতে মড়মড় করে মাস্তুল ভেঙে জলে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে মাস্তুলের বন্দুকবাজও জলে ছিটকে গেল। কজন হার্মাদ এবার সঙ্গে সঙ্গে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ধরবার জন্যে সাঁতরে গেল। তিনজনের হাত থেকে সাঁতরে পালানো সহজ নয়, বন্দুকবাজ ধরা পড়ল। হার্মাদরা তাকে সেই জলে ভেজা অবস্থায় পিছমোড়া করে ওপরে তুলে নিয়ে এল। লোকটা এতক্ষণ মাথা নিচু করে ছিল—হঠাৎ ওপরে এসে মুখ তুলতেই উজ্জ্বল সাধু, রূপ, কাঞ্চন, শ্রীধর সবাই একসঙ্গে অস্ফুট চিৎকার করে উঠল—এ কী, এ যে বসন্ত!

গঞ্জালেস বসন্তের মাথার ঝুঁটি ধরে নাড়া দিয়ে বললে, তোমার হাতে ভারি তাগ, না ছোকরা? আচ্ছা আগুনে একবার সেঁকে নিয়ে তারপর দেখা যাবে কত তাগ তুমি করতে পারো!

উজ্জ্বল সাধু হাত বাড়িয়ে কি বলতে গেলেন, কিন্তু একজন হার্মাদ তাঁর মাথায় এক আঘাত করে তাঁকে নীরব করিয়ে দিলে। হার্মাদরা বসন্তকে বেঁধে নিচে নিয়ে গেল।

* * *

গভীর রাত। নৌকোর খোলের ভেতর এক জায়গায় বসন্তকে একা বেঁধে ফেলে রাখা হয়েছে। হার্মাদরা জানিয়ে গেছে, কাল সকালে তাকে পুড়িয়ে কুকুর দিয়ে খাওয়ানো হবে।

ওপরে হার্মাদরা লুট সফল হওয়ার আনন্দে হল্লা করে ফুর্তি করছে। তারই আওয়াজ অস্পষ্টভাবে নিচে এসে পৌঁছচ্ছিল আর বসন্ত ক্ষোভে, রাগে দাঁতে দাঁত চেপে গুমরে উঠছিল। সে সকালে মারা যাবে তার জন্যে তার দুঃখ নেই, দুঃখ শুধু এইজন্যে যে, এই নরপিশাচদের উপযুক্ত শাস্তি সে দিতে পারল না। আরো কটাকে মেরে মরতে পারলে তার মনে শান্তি হত। কিন্তু আর উপায় নেই।

হঠাৎ তার মনে হল, উপায় কি সত্যিই নেই? হার্মাদরা সব ফুর্তিতে মেতেছে, তার কাছে কেউ নেই। কোন রকমে

হাতের বাঁধন যদি সে খুলতে পারে তাহলে নৌকোর জানলা দিয়ে বাইরে জলে নেমে যাওয়া শক্ত নয়। একবার বাইরে বেরুতে পারলে হার্মাদদের আরো গোটাকতককে সাবাড় করবার সুবিধে মিলবেই। কিন্তু হাতের বাঁধন পায়ের বাঁধন খোলা যায় কী করে? কোনরকম একটা ধারালো জিনিস থাকলে কোনরকমে তাইতে ঘষে বাঁধন কাটা যেত। নৌকোর খোলে একটা তেলের বাতি মিটমিট করে জ্বলছে, তার আলোয় চারিদিকে চেয়ে তেমন কিছুই সে দেখতে পেল না।

নাঃ, উপায় নেই। প্রতিশোধ ভালো করে না নিয়েই তাকে পুড়ে মরতে হবে। হঠাৎ পিছমোড়া করে বাঁধা থাকা সত্ত্বেও বসন্ত উঠে বসল। উপায় তো আছে! পুড়ে মরার কথা মনে হবার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হয়, বাতির আলোতে বাঁধন সে পুড়িয়ে ফেলতে তো পারে! এখন কেউ না দেখতে পেলে হয়! কোন রকমে ঘষড়ে ঘষড়ে কী কষ্টে যে সে বাতির কাছে পৌঁছল তা বলা যায় না। কিন্তু এখানেও আর-এক অসুবিধে। কোনরকমে উঠে দাঁড়াতে হয়ত সে পারে, কিন্তু পেছন দিকে ভালো করে দেখা তো যায় না! হাতের বাঁধন পোড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত হাত পুড়ে উঠল। অসহ্য যন্ত্রণায় তার মুখ বিকৃত হয়ে উঠল, কিন্তু সে ছাড়ল না। বাঁধন পুড়ে ছিঁড়ে গেল, তখন তার হাত পুড়ে কালো-কালো ফোস্কা হয়ে গেছে। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করবার সময় আর নেই। ক্ষিপ্র হাতে পায়ের বাঁধন খুলে ফেলে বসন্ত খোলের জানলা দিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে জলে নেমে পড়ল। জলে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার হাতের যন্ত্রণায় প্রথমে মনে হল সে বুঝি অজ্ঞান হয়ে যাবে। কয়েক মিনিট সে যন্ত্রণা একটু সামলে নিয়ে নৌকোর ধার দিয়ে নিঃশব্দে সাঁতরে যেতে-যেতে সে নিজের কর্তব্য স্থির করে নিলে। সমস্ত হার্মাদ নৌকোগুলির ওপর উৎসবে মত্ত। একজন শুধু হাল ধরে নদীর স্রোতে ধীরে

ধীরে নৌকোগুলি চালিয়ে নিয়ে চলেছে। অন্ধকার রাত্রি, নদীর ওপর এক হাত দূরের জিনিস দেখা যায় না। আস্তে আস্তে সাঁতরে গিয়ে হালের কাছে আবার নৌকো ধরল। ধীরে ধীরে সে নৌকোর গা বেয়ে তারপর ওপরে উঠে গেল। হালে বসে ঝিমোতে ঝিমোতে একজন মাত্র হার্মাদ নৌকো চালাচ্ছে। কাছে কেউ কোথাও নেই। এই একজনকে কাবু করতে পারলেই হয়। কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব! গায়ে তার অত জোর নেই, যে এই যমদূতের মত চেহারাকে শুধু-হাতে সে মেরে ফেলতে পারে। অস্ত্রশস্ত্রও তার সব কেড়ে নেওয়া হয়েছে। কোন রকমে হার্মাদ মাঝির কোমরবন্ধ থেকে তার তরোয়ালটা খুলে নেওয়া যায়! মাঝির পেছনে গুঁড়ি মেরে বসে বসন্ত নিঃশব্দে হাত বাড়িয়ে দেখলে, সে তরোয়াল নেওয়া শক্ত। লোকটা ঝিমুচ্ছে, কিন্তু একেবারে ঘুমোয়নি। বসন্ত বসে বসে উপায় ভাবতে লাগল।

হঠাৎ বিধাতাই সুযোগ করে দিলেন। লোকটা ঝিমোতে ঝিমোতে হঠাৎ একবার সামনে ঘুমের ঘোরে টলে পড়ল। সেই মুহূর্তে তার কোমর থেকে তরোয়াল খুলে নিয়ে বসন্ত উঠে দাঁড়ালো। কোমরে টান পড়ায় হার্মাদও সজাগ হয়ে ফিরে দাঁড়ালো, কিন্তু তখন তার সময় ফুরিয়েছে। এক কোপে তার ছিন্ন মুণ্ড ঘাড় থেকে পেছনে ঝুলে পড়ল। লাশটা থেকে তার জামাকাপড় খুলে নিয়ে বসন্ত লাশটা একধারে চাপা দিয়ে রেখে দিলে। জামা পেণ্টুলেন সে পরল বটে, কিন্তু তার গায়ে সেগুলো ঢল-ঢল করতে লাগল। তা হোক, তবু দূর থেকে দেখে চিনতে পারা যাবে না। এইবার কী করবে সেই হল সমস্যা। কোন রকমে নৌকোটাকে তীরের কাছে নিয়ে কোন চড়ায় ঠেকিয়ে দিতে পারলে কাজ হয়। তীর কতদূর না জেনেও সে ধীরে ধীরে নৌকোর হাল ঘুরিয়ে দিল। অধিকাংশ হার্মাদ ফুর্তি করবার জন্য সদাগরের বড় ময়ুরপঙ্খীতে এসে জড় হয়েছে। এই নৌকোতেই

সদাগরের সমস্ত মাঝি-মাল্লা লোক-লস্করকে বেঁধে রাখা হয়েছে। অন্য নৌকোগুলিতে শুধু দরকার-মত দু-একজন ছাড়া আর কেউ নেই। নৌকো চড়াতে লাগালে হার্মাদেরা কয়েকজন চরে নামবেই—নৌকো ঠেলে জলে ভাসাতে। সেই সময় কিছু-না-কিছু করা যাবে।

চড়া সত্যিই বেশি দূরে ছিল না। হঠাৎ সশব্দে নৌকো চড়ায় ঠেকে থেমে গেল। নৌকো অনেকখানি ওপরে উঠে গেছে। হার্মাদেরা ভিড় করে নৌকোর পাটাতনের ওপরে এসে দাঁড়ালো। গঞ্জালেস ক্রুদ্ধ গলায় জিজ্ঞাসা করলে, এই কুকুর সিবাস্টিয়ান! নৌকা চড়ায় ঠেকল কেন?

মুখে কাপড় পুরে যথাসম্ভব ভিার গলায় হার্মাদের স্বর অনুকরণ করে বসন্ত বললে, কসুর হয়ে গেছে সর্দার, টের পাইনি।

অন্য সময় হলে কী হত বলা যায় না, কিন্তু এ সময়ে গঞ্জালেসের মেজাজ ভালো ছিল। আর কিছু না বলে সে আদেশ দিলে, শিগগির নেমে গিয়ে নৌকো ঠেলে জলে ভাসাও। হার্মাদরা সবাই মদ খেয়ে উন্মত্ত হয়ে ছিল, আদেশ পাওয়ামাত্র হুড়-হুড় করে প্রায় সবাই নিচে নেমে গেল। এতটা বসন্ত আশা করে নি। এইবার সুযোগ! গঞ্জালেস নৌকোর ধারে গিয়ে মাথা নিচু করে হার্মাদদের কী করতে হবে চিৎকার করে বুঝিয়ে দিচ্ছিল। মৃত সিবাস্টিয়ানের কোমরের ছোরাটা খুলে নিয়ে বসন্ত নিঃশব্দে গঞ্জালেসের পেছনে গিয়ে দাঁড়ালো। তারপর প্রাণপণে জোর সংগ্রহ করে তার পিঠে ছুরি বসিয়ে দিলে। গঞ্জালেস কথাটি পর্যন্ত না কয়ে তৎক্ষণাৎ নিচে লুটিয়ে পড়ল। নিচে হার্মাদরা নৌকো ঠেলায় ব্যস্ত, তারা কিছুই জানতে পারলে না। এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে বসন্ত নিচে নৌকোর তলায় যেখানে তার বাবা ভাই মাঝি-মাল্লারা বন্দী হয়ে ছিল সেখানে নেমে গিয়ে একে-একে সকলের বাঁধন কেটে দিয়ে বললে, যা পারো অস্ত্র-শস্ত্র

নিয়ে শিগগির নৌকোর ধারে এসো ! হার্মাদরা প্রায় তখন নৌকো ঠেলে জলে নামিয়ে এনেছে। নৌকো জলে ভাসবামাত্র যেই হার্মাদরা ওপরে উঠতে যাবে অমনি দেখা দিয়ে তাদের সংহার করতে বলে বসন্ত আবার গিয়ে হাল ধরলে।

কিছুক্ষণ বাদেই হার্মাদদের ঠেলায় নৌকো জলে ভাসল। তৎক্ষণাৎ হাল ঘুরিয়ে বসন্ত নৌকোর মুখ তীর থেকে ফিরিয়ে দিলে। হার্মাদরা প্রথমটা থতমত খেয়ে তারপর নৌকোয় ওঠবার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখলে, সেখানে সমস্ত সদাগরের মাঝি-মাল্লা তরোয়াল-বল্লম-বন্দুক উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যে-কজন এ সত্ত্বেও ওঠবার চেষ্টা করল তাদের পরিণাম দেখে অন্যান্য দস্যুরা আর চেষ্টা করতে সাহস করলে না। নৌকোর মুখ ফিরিয়ে বসন্ত কিছুক্ষণের মধ্যে তাকে একেবারে হার্মাদদের নাগালের বাইরে এনে ফেললে ! হার্মাদদের অন্যান্য নৌকো অন্ধকারে এসব কিছুই জানতে না পেরে অন্যদিকে চলে গেছে। সামনে আর কোন বিপদ নেই। ধনরত্ন ও কটা নৌকো গেছে যাক, প্রাণে বাঁচতে পেরে মাঝি-মাল্লাদের তখন আর আনন্দের সীমা নেই। তারা বসন্তকে নিয়ে কী যে করবে ভেবে পায় না !

রূপ আর কাঞ্চন শুধু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, তোর বন্দুকের অত তাগ হল কবে রে—তুই শিখলি কোথায় ?

বসন্ত হেসে বললে, বন্দরে নেমে বেসাতি করতে যাবার সময় আমাকে তো সঙ্গে নিতে না, আমি তখন কোন কাজ না পেয়ে বাবার বন্দুক নিয়ে ছোঁড়া অভ্যাস করতাম।

উজ্জ্বল সাধু ছেলের কাছে এসে তার পিঠ চাপড়ে আদর করে বললেন, তুই যা করেছিস তার পুরস্কার দেওয়া যায় না, তবু তুই যা চাস আমি দেব,—বল্, কী চাস !

মাথা নিচু করে নৌকোর ওপর পা ঘষতে ঘষতে বসন্ত অস্পষ্ট স্বরে বললে, আমার সেই পুঁথিগুলো যদি···

চড়ুই পাখিরা কোথায় যায়

বলতে পারো, চড়ুই পাখিরা কোথায় যায় ?

তারা তো মরে না! ছোটবেলা দু-একটা বাচ্চা কখনো-কখনো বাসা থেকে গড়িয়ে পড়ে, কিন্তু বড় চড়ুই পাখিকে মরতে দেখেছ কেউ কি ?

মানুষকে তারা ভালোবাসে। একদিন সব পাখিই হয়ত বাসত। কিন্তু আমাদের চালচলন, স্বভাব-চরিত্র দেখে হতাশ হয়ে সবাই আমাদের ছেড়ে গেছে। শুধু চড়ুই পাখিরা আজও আছে আমাদের সঙ্গে। আমাদের উঠোন, দালান, ঘর-দোরে তারা সারাদিন খেলা করে, আমাদের ছাদের কড়িকাঠের ফোকরে বাসা বেঁধে রাতে তারা ঘুমোয়। তাদের ভাষা আমরা বুঝি না, নইলে সারাদিন তারা কিচির-মিচির করে আমাদের কথাই যে বেশিরভাগ বলে, আমরা জানতে পারতাম।

চড়ুই পাখিরা সবাইকেই ভালোবাসে, কিন্তু এক-একটি চড়ুই-এর এক-একটি বিশেষ আদরের ছেলেমেয়ে থাকে। সে তার একেবারে আপনার। তাকে নিয়েই তার জীবন।

দুটো চড়ুই যখন ঝটাপটি করে ঝগড়া করছে মনে হয়, তখন হয়ত তোমাদের কথা নিয়েই তাদের তর্ক বেধেছে।

কালো-ঠোঁটওয়ালা ঐ ডাগর পাখিটা হয়ত ঘাড়ের রোঁয়া-ফোলানো অন্য চড়ুইকে বলেছে, তোমার কুট্টুস বড় হিংসুক, অত-গুলো লজেঞ্জুস কিনে এনে দিদিকে একটা দিতে চায় না।

এই না শুনেই ও চড়ুইয়ের ঘাড়ের রোঁয়া উঠেছে ফুলে, আমার কুট্টুস হিংসুক! সেদিন রাস্তা থেকে আইসক্রীম কিনে কে ছুটতে ছুটতে এসেছিল দিদিকে ভাগ দেবার জন্যে ?

কিন্তু আজ? আজ বুঝি দিদিকে একটা লজেঞ্জুস দেওয়া যায় না?

যাবে না কেন? কিন্তু কুট্টুসের বুঝি রাগ হতে নেই! সকালবেলা দিদি ওকে অমন বকুনি খাওয়ালো কেন? বাবার চশমাটা চোখে দিয়ে নাহয় একটু বড় হতেই চেয়েছিল। ভেঙে তো আর ফেলেনি!

কুট্টুস আর দিদির ভাব হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদেরও ঝগড়া অবশ্য মিটে যায়। কিচির-মিচির করতে করতে তারা কলতলায় উড়ে যায় চাল-ধোওয়ার তদারক করতে।

যে-সব-চালগুলো ধুতে গিয়ে পড়ে যায়, সেগুলো তো আর নষ্ট হতে দেওয়া যায় না!

যতদিন পারে চড়ুইরা এমনি করে মানুষের সুখদুঃখের ভাগ নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে থাকে। কিন্তু এখানকার মেয়াদ তাদেরও একদিন ফুরোয়। তখন তারা কোথায় যায়? কেউ তা জানে না।

আমাদের কুট্টুস সকলকে জিজ্ঞাসা করেছে। কেউ ঠিক করে কিচ্ছু বলতে পারে না।

ঠাকুরমা হেসে বলেছেন, জানিনা বাপু, এমন অনাছিষ্টি কথাও কখনো শুনিনি। নিজে এখন কোথায় যাব তারই ঠিক নেই, চড়ুই পাখিরা কোন্ চুলোয় যায় তার ঠিকানা বার করতে হবে!

মা বলেছেন, কোথায় যাবে আবার? স্বর্গে যায়।

কিন্তু কোথায় সেই চড়ুই পাখিদের স্বর্গ···কেমন করে তারা সেখানে যায়?

দিদি বলেছে, জানিস না? রাত হলে ওরা সব জোনাকি হয়ে উড়ে চলে যায়।

কথাটা মন্দ নয়, কিন্তু জোনাকি হয়ে যেতে কেউ তো ওদের দেখেনি।

মাস্টারমশাই বলেছেন, এসব বাজে কথা। কোথায় আবার যাবে! রাস্তায় ঘাটে মরে পড়ে থাকে, কাক-চিলে নিয়ে যায়।

কথাটা কুট্টুসের মোটেই পছন্দ হয়নি। রাস্তায় ঘাটে মরা চড়ুই সে তো কখনো দেখেনি!

বাবা বলেছেন হেসে, চড়ুই পাখিরা কোথায় যায়? নিজেই একদিন দেখো না, তাহলেই জানতে পারবে!

কুট্টুস তাই নিজেই দেখবে ঠিক করেছে।

কিন্তু এত তাড়াতাড়ি সে দিন এসে পড়বে কে জানত! সেদিন রাত্রে সেই রোঁয়া-ফোলানো চড়ুইটা কিছুতেই আর বাসায় যেতে চায় না। কুট্টুস জানে, সন্ধে হতে-না-হতেই রান্নাঘরের চালের ওপর শেষ মজলিস সাঙ্গ করে তারা যে-যার বাসায় গিয়ে ঢোকে। আজ কিন্তু পড়াশুনো খাওয়া-দাওয়া শেষ করে সে শুতে যাচ্ছে, এমন সময় শুনল মা বলছেন, দেখেছ পাখিটার কাণ্ড! হতভাগা বাসায় না গিয়ে মরতে এখানে বসে আছে কেন?

সত্যিই সেই রোঁয়া-ফোলানো চড়ুইটা তার ঘরের ইলেকট্রিক ফ্যানের একটা পাখার ওপর ডানা গুটিয়ে কুঁকড়ে-মুঁকড়ে বসে আছে চুপ করে।

কুট্টুসের মশারি ফেলে দেবার জন্যে মা ঘরে এসে আলোটা জ্বালাতেই পাখিটা একেবারে চমকে উঠে ফর-ফর করে এদিক-ওদিক খানিক উড়ে বেড়ালো। তারপর আবার বসল সেই পাখার ওপর।

মা বললেন, আচ্ছা মুস্কিল তো রে বাপু! এখুনি পাখা চালালে হতভাগা তো এদিকে-সেদিকে যেখানে হোক বসে শেষ পর্যন্ত বেড়ালের পেটে যাবে!

কুট্টুস তাড়াতাড়ি বলে উঠল, আজ আর পাখা চালিয়ো না মা, আমার একটুও গরম লাগছে না।

মা হেসে বললেন, দূর, সে কি হয়! তারপর পাখিটাকে বাসায় পাঠাবার কত চেষ্টাই তিনি করলেন। কিন্তু সে ঘুরে-ফিরে সেই পাখায় এসে বসবেই। কিছুতেই বাসায় যাবে না।

কুট্টুস হতাশ হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, কেন আজ বাসায় যাচ্ছে না মা?

কেন আর! মরণ ঘনিয়ে এসেছে বোধহয়! বলে পাখিটার ওপর রাগ করেই মশারি ফেলে দিয়ে চলে গেলেন।

কুট্টুসের কিন্তু ঘুম আর আসে না। সত্যিই কি পাখিটার মরণ ঘনিয়ে এসেছে! আজ তাহলে সে, সব চড়ুই পাখিরা যেখানে যায় সেইখানে যাবে? না, কিছুতেই আজ ঘুমোনো হবে না। আজ তাকে দেখতেই হবে, চড়ুই পাখিরা কোথায় যায়!

একটু একটু করে অনেক রাত হল। দূরের রাস্তায় ট্রামের শব্দ অনেকক্ষণ গেছে থেমে। কোথায় একটা ঝিঁঝিপোকা ডাকছে —ডাক নয়, সে যেন ঘুমপাড়ানি সুর। আকাশ থেকে ঝিম-ঝিম করে ঘুম নেমে আসছে।

কিন্তু কুট্টুস কিছুতেই ঘুমোবে না—কিছুতেই না। বিছানায় সে উঠে বসল। বাঃ, ঘরটায় আর অন্ধকার নেই। এরই মধ্যে আলো জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে কে।

সে উঠে বসতেই চড়ুই পাখিটা পাখার ওপর থেকে বলে উঠল, কী কুট্টুস!

আশ্চর্য! চড়ুইএর কথা সে বুঝতে পারছে নাকি! চড়ুই সত্যিই তার নাম ধরে ডেকেছে! অবাক হয়ে তার দিকে চোখ তুলে তাকাতে আর কোন সন্দেহ রইল না। চড়ুই বললে, আজ আমি চললাম ভাই। ভালোই হল, যাবার সময় তোমার সঙ্গে কথা বলে গেলাম। কতদিন তোমার কাছে-কাছে থেকে কত কথা বলেছি, তুমি তো বুঝতে পারনি!

তুমি আজ সত্যিই যাবে? কুট্টুসের চোখ তখন ছলছল করছে।

চড়ুই বললে, যেতেই হবে যে ভাই! যতদিন তুমি খুব ছোট ছিলে, ততদিন তোমার জন্যেই এখানে ছিলাম। এবার আমার এখনকার মেয়াদ ফুরিয়েছে।

কোথায় তুমি যাবে? আমার বড় দেখতে ইচ্ছে করে। নিয়ে যাবে আমায়?

যাবে তুমি? কিন্তু সে যে অনেক দূর!

তা হোক, আমায় নিয়ে যেতেই হবে।

বেশ, তাহলে তৈরি হয়ে থাকো। আর বেশি দেরি নেই।

দেরি নেই শুনে কুট্টুসের বুকটা উৎসাহে উত্তেজনায় কেঁপে উঠল। কিন্তু তৈরি হয়ে থাকবে কী করে সে তো জানে না! সে ভাবনা অবশ্য আর বেশিক্ষণ ভাবতে হল না। দেখতে-দেখতে হালকা একটা সাদা মেঘ জানলা দিয়ে ঘরের ভেতর নেমে এল। চারিদিক আবছা হয়ে গেল কুয়াসার পর্দায়। তারপর কুট্টুস টের পেল, ঘর-দোর বাড়ি সহর সব কোথায় হারিয়ে গেছে। সাদা মেঘের আঁচল জড়িয়ে চড়ুইয়ের সঙ্গে সে শূন্য আকাশে ভেসে চলেছে।

অনেক নিচে চেয়ে দেখলে হয়ত রাতের পৃথিবী এখনো দেখা যায়। সহরের আলোগুলো জোনাকির মৌচাকের মত এক জায়গায় জমে আছে। সে আলোও ক্রমশ হারিয়ে গেল। শুধু অসীম শূন্য! রঙবেরঙের মেঘ এদিকে-ওদিকে তাদেরই পাশ দিয়ে ভেসে যাচ্ছে।

খানিক বাদেই বোঝা গেল যে, সেগুলো নেহাৎ শুধু মেঘ নয়। হঠাৎ একটা করুণ কান্না শুনে কুট্টুস চমকে উঠে দেখে, একটা ছোট্ট জলভরা কালো মেঘ তাদের পাশ দিয়েই ভেসে যাচ্ছে। অবাক হয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে, একি, কাঁদছে কে?

চড়ুই বললে, কাঁদছে বোধহয় পৃথিবীর কোন ছেলেমেয়ে। ওরকম কান্না এখানে অনেক শুনবে। পৃথিবীর সমস্ত কান্নাহাসি এখানে ভেসে আসে—এটা কান্নাহাসির আকাশ কিনা!

চড়ুইয়ের কথা শেষ না-হতেই মেঘটি নিজের থেকে বলে

উঠল, হ্যাঁ, আমি এক ছোট মেয়ের কান্না। তার মা বাবা কেউ নেই। যাদের বাড়িতে থাকে তারা অনেক কষ্ট দেয়। রাতদিন খাটায়। আজ কাঁচের একটা গেলাস ধুতে গিয়ে সে ভেঙে ফেলেছে। তাই মার খাবার ভয়ে সে কাঁদছে···

কুট্টুসের আরো শোনবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু সাদা মেঘ সে কান্নাকে পেছনে ফেলে হু-হু করে এগিয়ে গেল। চড়ুই পাখি বললে, শুধু কান্না নয়, এখানে হাসিও মাঝে মাঝে ভেসে আসে।

বলতে বলতে একটা রাঙা সোনালি মেঘ তাদের পাশ দিয়ে আনন্দে ঝলমল করতে করতে উড়ে গেল। সারা গা দিয়ে তার হাসি যেন ঠিকরে পড়ছে। কুট্টুস শুনতে পেল, সে বলছে, পেয়েছি! পেয়েছি!

কী পেয়ে ওর এত খুশি? কুট্টুস অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে।

চড়ুই বললে, এমন কিচ্ছু নয়। অনেক কষ্টে ফুটবল ম্যাচ দেখবার একটা টিকিট পেয়েছে কিনা, তাই ছেলেটির এত আনন্দ।

আকাশে এবার যেন ঝড় বইতে শুরু করেছে। হু-হু করে তাদের সাদা মেঘ ভেসে চলেছে। হঠাৎ কড়-কড় কড়াৎ! আগুনের হল্‌কায় চোখ মুখ তাদের যেন ঝলসে গেল! তারপর সে কী দুর্যোগ! চারিদিক থেকে আকাশ গর্জন করছে, আগুনের সাপের মত লকলকে জিভ বার করে বিদ্যুৎ ঝিলিক দিচ্ছে মুহূর্তে-মুহূর্তে।

চড়ুইকে জড়িয়ে ধরে কুট্টুস ভয়ে-ভয়ে বললে, এ আমরা কোথায় এলাম!

চড়ুই বললে, পৃথিবীর মানুষের মনে যেখানে যত বিষ আছে এখানে তাই বজ্র-বিদ্যুৎ হয়ে ফুটে ওঠে। মানুষের যত অন্যায় অত্যাচার বা হিংসা লোভ, যত শয়তানি আর স্বার্থপরতা—সব মিলে এইখানে এই ঝড় তুলেছে। মানুষের মনের বিষ না কাটলে এ

ঝড় আর থামবে না।

অনেকক্ষণ বাদে সেই তুফানের রাজ্যও তারা পেছনে ফেলে এল ক্রমশ যেন বড় ঠাণ্ডা মনে হচ্ছে। কুটুসের বেশ শীত করছে দেখতে দেখতে তাদের মেঘও সেই ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে তুষার হয়ে ধীরে ধীরে তাদের নিয়ে নিচে ঝরে পড়ল।

এ কী আশ্চর্য দেশ! যতদূর দেখা যায় শুধু সাদা তুষারে ঢাকা ঠাণ্ডায় হাড়ের ভেতর পর্যন্ত কাঁপিয়ে দেয়!

শীতে কাঁপতে-কাঁপতে যতখানি সম্ভব চড়ুইয়ের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে কুটুস ভয়ে-ভয়ে বললে, এইখানেই তোমায় থাকতে হবে নাকি?

চড়ুই বললে, হ্যাঁ, পৃথিবী ছেড়ে এসে এইখানেই আমার থাকি

কিন্তু এখানে যে তোমার বড় কষ্ট হবে! চারদিকে শুধু বরফ!

চারিদিকে শুধু বরফ বটে, কিন্তু তোমার কাছে ভরসা পেলে এখানে থাকতে আমার কষ্ট নাও হতে পারে। এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে চড়ুই আবার বললে, ভালো করে চেয়ে দেখ, এ তুষারের দেশ বটে, কিন্তু সব জায়গাই বরফে ঢাকা নয়।

সত্যিই চড়ুইয়ের কথা মিথ্যে নয়! চারিধারের তুষারের মাঝে এক-একটা জায়গা কোন জাদুমন্ত্রে যেন সবুজ হয়ে আছে। কোন অদৃশ্য উত্তাপ যেন সেখান থেকে সমস্ত তুষার গলিয়ে সরিয়ে দিয়েছে।

চড়ুই বললে, পৃথিবীর যেখানে যে যতখানি ভালো কাজ করে তার হৃদয়ের উত্তাপ এমনি করে এখানকার বরফ ততখানি গলিয়ে দেয়। শুধু নিজের কথা না ভেবে সবাইকার জন্যে যারা কাজ করে যায়, তাদের বুকের উত্তাপ এইখানে এসে জমা হয়। আর সে উত্তাপ পেলে আমাদের কোন কষ্ট কখনো থাকে না।

তাদের চোখের সামনেই কাছাকাছি একটা জায়গায় তুষার গলে

গায়ে উজ্জ্বল সবুজ খানিকটা ঘাসে-ঢাকা জমি ফুটে উঠল। দেখা গেল, একটি চড়ুই সেখানে পাখনা ঝাড়ছে।

তুমি কোথা থেকে আসছ গো? কুট্টুস এগিয়ে গিয়ে না জিজ্ঞাসা করে পারল না।

পাখনা ঝাড়া শেষ করে নতুন চড়ুই পাখিটি বললে, আমি আসছি চীন থেকে। তান্‌ফু বলে একটি ছোট ছেলের মন আছে আমার জিম্মায়। বড় তারা গরিব। যুদ্ধের সময় তারা গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। ফিরে এসে দেখে, গ্রাম একেবারে শ্মশান হয়ে গেছে। তাদের গাঁয়ের পাশে একটা পাগলা প্রকাণ্ড নদী আছে। ফি-বছর তাদের ঘর-বাড়ি ক্ষেত-খামার সব বানে ভাসিয়ে দেয়। তান্‌ফু ঠিক করেছে, বড় হয়ে সেই নদীতে স একটা বাঁধ দেবে আর পোল বানাবে একটা এপার থেকে ওপারে। ইঞ্জিনিয়ার হবার জন্যে তাই কাউকে কিছু না বলে সে একলা শহরে পালিয়ে যাচ্ছে। তার মনের উত্তাপেই এখানকার বরফ এমন গলে গেছে।

চীনদেশের চড়ুইয়ের কথা শেষ হবার আগেই দেখা গেল, কুট্টুস আর তার নিজের চড়ুইয়ের চারিধারে অনেকখানি বরফ গলে সরে গিয়েছে! কুট্টুসের চড়ুই পাখি ঘাড়ের রোঁয়া ফুলিয়ে ডানাদুটো দুবার ঝেড়ে বললে, জানতাম, আমি আগেই জানতাম! কুট্টুস থাকতে কোনদিন আমায় শীতে কষ্ট পেতে হবে না! মনে মনে আজ যে প্রতিজ্ঞা করেছ, কোনদিন যেন তা না ভাঙে!

কুট্টুসের গলা তখন ধরে এসেছে। প্রায় চুপি-চুপি সে বললে, না, কোনদিন ভাঙবে না।

রোঁয়া-ফোলানো চড়ুই বললে, পৃথিবীর সব ছেলেমেয়ের মন যদিন তোমার মত হবে, সেদিন এদেশের কোথাও কোন তুষার আর থাকবে না। সাজানো বাগানের মত ফুলে-ফলে সব

জায়গা ভরে যাবে।

চড়ুই-এর কথা শেষ হতে-না-হতে কুট্টুসের মনে হল, চারি দিকের তুষার যেন ধোঁয়া হয়ে সব উড়ে যাচ্ছে। আবার চারিদিক ঝাপসা, ঝড়ের মত হাওয়া বইছে আর কুট্টুস তাইতে ভেসে চলেছে।

হঠাৎ কুট্টুস শুনতে পেল, মা তাকে ডাকছেন। চোখ রগড়ে সে বিছানায় উঠে বসল, তারপর ক্রমেই তার চোখ গেল সেই পাখির ওপর। চড়ুই পাখিটা সেখানে নেই। মা যেন তার মনের কথা টের পেয়ে বললেন, চড়ুই পাখিটা খুঁজছিস ? সে কি আর আছে ? গেছে কোথায় কোন বেড়ালের পেটে !

কুট্টুস কোন উত্তর দিলে না। চড়ুই পাখিরা কোথায় যায় সে জানে।

কালাপানির অতলে

তোমাদের যদি বলি আর-বছরের গোড়ার দিকে আলিপুরের হাওয়া-আপিসের ভূকম্পন-মানযন্ত্রে শ-তিনেক মাইল দূরের পৃথিবীর মাটির ওপরে নয়, বঙ্গোপসাগরের জলের নিচে এমন একটা দারুণ ভূমিকম্প ধরা পড়ে যাতে সমুদ্র তোলপাড় হয়ে গেছল এবং তারই সঙ্গে যদি বলি চাটগাঁয়ের কক্সবাজারের শুঁটকি-মাছের বাজার বছরের মাঝামাঝি অত্যন্ত চড়ে যায়, এবং এই দুই অসংলগ্ন কথার সঙ্গে যদি জুড়ে দিই যে জল-ঝড় নেই—পৌষমাসের শেষাশেষি একদিন কক্সবাজারের জেলে-নৌকোর এক বিরাট বহর আশ্চর্যভাবে সমুদ্রের মাঝে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়, তাদের কারও পাত্তাই পাওয়া যায় না,—তাহলে তোমরা এই তিনটি ছাড়া-ছাড়া ব্যাপারের মধ্যে কোন সম্বন্ধ না পেয়ে নিশ্চয়ই আমায় পাগল ভাববে।

কিন্তু এই তিনটি পৃথক ব্যাপারের ভেতর কী ভয়ঙ্কর সম্বন্ধ যে আছে তাই তোমাদের আজ বলতে বসেছি।

সেবার চট্টগ্রামে বেড়াতে গিয়ে রমানাথবাবুর সঙ্গে সৌভাগ্য-ক্রমে আমার আলাপ হয়। রমানাথ বাজপেয়ীর নাম তোমরাও হয়ত কেউ-কেউ শুনেছ। যারা শোনোনি তাদের জন্যে তাঁর একটু পরিচয় দিচ্ছি। রমানাথবাবু বাঙালী হয়েও নেপলসের বিখ্যাত অ্যাকোয়ারিয়ামে তিন বছর প্রধান কার্যাধ্যক্ষ ছিলেন। নেপলসের অ্যাকোয়ারিয়ামের মত আশ্চর্য জিনিস পৃথিবীতে আর নেই। চিড়িয়াখানায় যেমন পৃথিবীর জীবজন্তু ধরা থাকে, এই অ্যাকোয়ারিয়ামে তেমনি সমুদ্রের যত অদ্ভুত জীবন্ত প্রাণী সাধারণের দেখবার জন্যে ধরে রাখা আছে। এই জলচর-নিবাসের

অধ্যক্ষের পদ যে-সে লোক পায় না। বাজপেয়ী মশাইয়ের মত সামুদ্রিক প্রাণী-তত্ত্বে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত ইয়োরোপেও খুব কম আছে বলেই তাঁকে এই পদ দেওয়া হয়।

আপাতত তিনি এ কাজ ছেড়ে দিয়ে বিলেতের এক বৈজ্ঞানিক সভার অনুরোধে বঙ্গোপসাগরের সামুদ্রিক প্রাণী সম্বন্ধে গবেষণা করবার ভার নিয়ে চট্টগ্রামে আস্তানা পেতেছিলেন—সেইখানেই তাঁর সঙ্গে আলাপ।

অত্যন্ত অমায়িক লোক। আমি তাঁর কাছে অত্যন্ত নগণ্য ব্যক্তি হলেও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে আমাদের দেশের সামুদ্রিক জীবজন্তু সম্বন্ধে কিছু গবেষণা করবার চেষ্টা করছি শুনে তিনি অত্যন্ত আদর করে ডেকে আমার সঙ্গে এসব ব্যাপার নিজে থেকে আলাপ করতেন। তাঁর সব কথা বুঝতাম এমন গর্ব করতে পারি না, কিন্তু তাঁর কাছে যে অনেক কিছু শিখেছি এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

কক্সবাজারের জেলে-নৌকোর বহর যখন আশ্চর্যভাবে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়, তার কিছুদিন আগের কথা বলছি।

সকালবেলা তাঁর বাইরের ঘরে বসে আছি। তিনি শীঘ্রই সমুদ্রে তাঁর গবেষণার জন্যে সামুদ্রিক প্রাণীশিকারে যাবেন ঠিক হয়েছে। তার জন্যে ইতিমধ্যে একটা মাঝারি আকারের মোটর-লঞ্চও জোগাড় করা হয়েছিল, আপাতত তাতে জাল ফেলার সরঞ্জাম খাটিয়ে কয়েকজন ভালো জেলে সঙ্গে নেবার ব্যবস্থা হচ্ছিল। জেলেদের একজন সর্দারকে ডাকিয়ে তিনি তার সঙ্গে কথা কইছিলেন। আমি তাঁর লেখা একখানি বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছিলাম।

হঠাৎ তিনি আমায় ডেকে বললেন, শুনছ সুধীর! সমুদ্রে যাদের চোদ্দপুরুষ একরকম ঘরবাড়ি করে বাস করছে তাদেরও সমুদ্র সম্বন্ধে কীরকম কুসংস্কার এখনও আছে শুনলে?

আমি তাঁদের কথাবার্তা এতক্ষণ অনুসরণ করিনি। জিজ্ঞাসা করলাম, কী বলছে ?

বলছে, সমুদ্রে মাছ-টাছ আজকাল ভয়ানক দুষ্প্রাপ্য হয়েছে, জেলেদের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, তা সত্ত্বেও অনেকে আজকাল কাজে বেরুতে চায় না—ওদের বিশ্বাস, সমুদ্রে দানো জেগেছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, সে আবার কী !

এবার জেলে-সর্দার নিজেই উত্তর দিলে এবং সে যা বললে, তার মর্ম বুঝে অবাক হয়ে গেলুম। জেলেরা নাকি মিছিমিছি ভয় পায়নি। যেখানে মাছের ভারে সেদিন পর্যন্ত জাল ছিঁড়ে পড়ত সেখানে একটি মাছও যে পড়ে না এটাই তো একটা ভয়ের ব্যাপার ! কিন্তু এ ছাড়া তাদের অনেকে স্বচক্ষে এমন জিনিস দেখেছে যা বললে লোকে বিশ্বাস করবে না।

সর্দারকে আবার প্রশ্ন করায় সে যা বললে তা সত্যিই অদ্ভুত। মাছ ধরে ফিরতে অনেক সময় তাদের রাত হয়ে যায়। আজকাল মাছ পাওয়া যায় না বলে অনেক সময়ে তারা রাত পর্যন্ত না ঘুরে ফিরতেই পারে না। কয়েকদিন ধরে রাতে ফেরবার সময় তাদের অনেকে দেখেছে, দূরে সমুদ্রের জল থেকে আশ্চর্য রকমের রোশনাই উঠছে—সে আলো নাকি এমন তীব্র যে মনে হয়, সমুদ্রে কে বিজলি বাতির সার জ্বেলে রেখেছে।

হেসে বাজপেয়ী মশাইকে ইংরিজিতে বললাম, এসব সর্দারের মাইনে বাড়াবার ফিকির নয় তো ?

বাজপেয়ী মশাই বললেন, না। এর ভেতরে কিছু সত্য আছে বলে সন্দেহ হচ্ছে। কক্সবাজারের সমুদ্রে মাছ দুষ্প্রাপ্য হওয়াটা তো আর ওর বানানো নয়—এটাই তো আশ্চর্য।

সেদিন সর্দারের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত কয়েকজন জেলে জোগাড় করে দেবার চুক্তি বিনা গোলমালে হয়ে গেল। সমুদ্রের অদ্ভুত আলোর কথাও সেইসঙ্গে আমরা ভুলে গেলাম।

কিন্তু কয়েকদিন বাদেই যখন জেলে-নৌকোর বহর হারিয়ে গেছে সংবাদ এল এবং জল ঝড় না থাকা সত্ত্বেও দুদিন ধরে তাদের-কোন পাত্তা পাওয়া গেল না তখন বাজপেয়ী মশাই হঠাৎ অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

সকালে আমি যেতেই বললেন, কালকের খবর শুনেছ তো ?

বললাম, জেলে-নৌকোর কথা তো ? শুনেছি।

তিনি তাড়াতাড়ি বললেন, না হে না, শুধু ঐ নয়। যে-কজন লোক কাল ওদের খোঁজ করতে দুখানা নৌকা নিয়ে বেরোয়, তাদেরও পাত্তা নেই।

আশ্চর্য হয়ে বললাম, না, এ কথা তো শুনিনি। এ কী ব্যাপার !

তিনি বললেন, আমিও তো তাই ভাবছি। তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, দেখ, আমার আগেকার প্ল্যান আমি বদলালাম। আমি আজই লঞ্চ নিয়ে বেরুব। এ ব্যাপারের একটু তদন্ত তাড়াতাড়ি করা দরকার। তুমি আসতে পারবে তো ?

না আসবার কোন কারণ ছিল না। আমি সানন্দে রাজি হয়ে গেলাম। দুপুরবেলা কক্সবাজারের জেটি থেকে আমাদের লঞ্চ ছাড়ল। লঞ্চের সারেঙ খালাসি ও কয়েকজন জেলে ছাড়া আরোহী মাত্র আমরা দুজন।

লঞ্চটি যেমন মজবুত তেমনি বেগবান। দেখতে-দেখতে কক্সবাজার ছাড়িয়ে আমরা অকূল সমুদ্রে এসে পড়লাম। কক্সবাজারের পূর্বে মহিষখালি দ্বীপ। তারই কাছে সাধারণত এইসব জেলেরা নৌকো নিয়ে মাছ ধরতে যায়। সেইদিকেই আমাদের লঞ্চ চলছিল। কিন্তু কয়েক ঘণ্টা বাদে সেখানে পৌছে আমরা হারানো জেলেদের কোন চিহ্নই দেখতে পেলাম না।

এবার কী ভেবে জানি না, বাজপেয়ী মশাই লঞ্চের মুখ আরো দক্ষিণে ফিরিয়ে চালাতে বললেন। জিজ্ঞাসা করতে জানালেন,

কয়েকদিন এদিকে মাছ না পেয়ে নতুন জলের সন্ধানে জেলেদের দক্ষিণ দিকে এগিয়ে যাওয়া কিছু আশ্চর্য নয়।

তাঁর অনুমান যে সত্য, কিছুক্ষণ বাদেই তার ভয়ঙ্কর প্রমাণ আমরা পেলাম। ঘণ্টাখানেক ধরে আমরা এগিয়েছি, হঠাৎ একজন জেলে চিৎকার করে বললে, ঐ দেখুন বাবু!

ততক্ষণে আমাদের সকলের দৃষ্টি সেদিকে গেছে। দেখলাম, উল্টো হয়ে জেলেদের একটা নৌকো ভাসছে। আমাদের লঞ্চ তার কাছে গিয়ে থামল। খালাসি জেলেরা সবাই রেলিঙের ধারে এসে ভিড় করে দেখতে এল। কিন্তু এই অদ্ভুত ব্যাপারের কোন কারণ আমরা খুঁজে পেলাম না। জেলেদের নৌকোগুলি দস্তুরমত মজবুত এবং ঝড়ের ভেতরেও সহজে তা জলে ডোবে না; তাছাড়া ছেলেবেলা থেকে সমুদ্রে থাকার দরুন নৌকো চালানোতে তাদের জুড়ি পাওয়া ভার। সুতরাং তাদের নৌকো অকারণে এমন উল্টে যাওয়া আশ্চর্য নয় কি? নৌকোর আশেপাশে আমরা কিছুই দেখতে পেলাম না।

খানিক বাদে আবার লঞ্চ ছাড়া হল। এবারে আমরা যতই এগিয়ে যেতে লাগলাম, ততই হারানো বহরের নৌকো একটি একটি করে দেখা দিতে লাগল। সবগুলিই কোন অজানা কারণে একই ভাবে উল্টে গেছে এবং কোথাও জেলেদের একটি চিহ্নও নেই।

সত্যিই এবার আমার ভয় করছিল। আগের দিন হারানো জেলেদের খোঁজ করতে যারা এসেছিল তাদেরও কী পরিণাম হয়েছে স্মরণ করে বুকের ভেতরটা কেমন শিউরে উঠছিল। খালাসি ও জেলেদের সবার মুখেই দেখলাম ভয়ের ছায়া; শুধু বাজপেয়ী মশাই সমস্ত ভয়ের ওপরে থেকে অত্যন্ত তন্ময়ভাবে কি চিন্তা করতে করতে ডেকের ওপর পায়চারি করে বেড়াচ্ছিলেন।

ভাবছিলাম বাজপেয়ী মশাইকে লঞ্চ ফেরাবার আদেশ দিতে

অনুরোধ করব কি না, এমন সময় সমুদ্রের দিকে চেয়ে রমানাথবাবু অত্যন্ত ব্যস্তভাবে বললেন, সুধীর, শিগগির আমার দূরবীনটা দাও। দূরবীনটা তাঁর হাতে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে তিনি যা দেখেছেন তাও চোখে পড়ল।

আশ্চর্য ব্যাপার! কিছু দূরে সমুদ্রের কালো জলে মনে হল কে যেন মোটা একটা সবুজ পেন্সিল দিয়ে প্রকাণ্ড একটা লাইন টেনে দিয়েছে! দুঃখের বিষয়, রমানাথবাবু দূরবীন হাতে করতে-না-করতেই সে লাইন মিলিয়ে গেল। তিনি হতাশ হয়ে দূরবীন নামিয়ে বললেন, দেখেছ তো?

বললাম, হ্যাঁ! ঐ দেখুন, ডানদিকে আবার সেইরকম দেখা যাচ্ছে!

এবার আমাদের লঞ্চের ডানদিকে অতি অল্প দূরেই লাইনের মত নয়, খানিকটা থাবড়ার মত ঐ সবুজ রঙ দেখা দিল। ঠিক যেন খুব খানিকটা সবুজ কালি কে সমুদ্রে ফেলে দিয়েছে। দেখতে-দেখতে আমাদের চারিধারেই এবার এইরকম সবুজ রঙ দেখা দিতে লাগল।

রমানাথবাবু লঞ্চ থামাতে বললেন। দূরবীন চোখে নিয়ে সেই সবুজ ছোপ দেখতে-দেখতে তাঁর মুখ কেন জানিনা অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গেল। কিন্তু তাঁর তন্ময়তা দেখে কিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহস করলাম না।

লঞ্চ কয়েক মিনিট মাত্র থেমেছে, এমন সময় হঠাৎ সেটা অত্যন্ত দুলে উঠল এবং টের পেলাম, হঠাৎ লঞ্চ একদিকে হেলছে। সেই মুহূর্তেই সেই ভয়ঙ্কর জীবটিকে দেখলাম।

লঞ্চ হেলে পড়ায় সামনের দিকে ঝুঁকে সমুদ্রের পানে চেয়েছিলাম। মনে হল ঠিক আমাদের ডেকএর কাছে সমুদ্রের জলের কিছু নিচেই অমনই খানিকটা সবুজ রঙ দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ সেই সবুজ রঙ আরো স্পষ্ট হয়ে এল এবং তারপর যা দেখলাম তাতে

নিজের চোখকেই প্রথমত বিশ্বাস করা শক্ত হয়ে পড়ল। দেখলাম, ছোট-ছোট শুশুকের মত একটি সবুজ জীব; কিন্তু তা শুশুক তো নয়ই, সমুদ্রের যত প্রাণী মানুষের চোখে এ-পর্যন্ত পড়েছে তার কোনটার সঙ্গেই তার মিল নেই। পেছনের দিকে খানিকটা শুশুকের মত হলেও সামনে তার অনেকটা অক্টোপাসের মত গোটা-চারেক শুঁড়ো বেরিয়েছে। সবচেয়ে ভীষণ সে জীবটির দাঁতালো প্রকাণ্ড মুখ আর সাপের মত নিষ্ঠুর চোখ! দেখতে-দেখতে সেটা ডুবে গেল কিন্তু তারপরেই দেখলাম, আমাদের লঞ্চের চারিধারে ক্ষুধিত নেকড়ের পালের মত অসংখ্য এই জাতীয় জীব ঘিরে এসেছে। আমাদের চারিধারের জল সবুজ হয়ে গেছে তাদের ভিড়ে।

লঞ্চের সবাই এখন বিস্ময়বিমূঢ় ভাবে সেইদিকে চেয়ে ছিল। সারেঙ একটা বালতিতে খানিকটা নোংরা ইঞ্জিনের তেল বাইরে ফেলতে এসে বললে, লঞ্চ ভয়ানক হেলছে কেন বুঝতে পারছি না বাবু!

লঞ্চ যে হেলছে এটা আমরা সবাই বুঝতে পারছিলাম, কিন্তু তাতে বিশেষ ভয়ের কিছু আছে, এতক্ষণ আমাদের মনে হয়নি। সারেঙের কথায় আমরা চমকে উঠলাম। লঞ্চ হেলার সঙ্গে এই জীবগুলির কোন সম্বন্ধ নেই তো! আর সকলের কথা জানিনা, আমার মনে ঐ রকমই একটা সন্দেহ হচ্ছিল।

রমানাথবাবুর ধ্যান তখনও ভাঙেনি। ডেকএর নিচেই যেখানে সারেঙের ফেলা ময়লা তেলটা ভাসছিল সেইদিকে চেয়ে তিনি তখনও একমনে কি ভাবছিলেন। লঞ্চ তখন এতটা হেলে পড়েছে যে আমরা ভয়ে-ভয়ে অপর দিকে গিয়ে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছি। জেলেদের মুখ দেখলাম শুকিয়ে গিয়েছে একেবারে। সর্দার আমার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। জাতে সে মঘ—শুকনো মুখে 'ফয়া'র নাম করে সে বললে, আজ আর নিস্তার নেই বাবু, জেলের বহরের যে

দশা হয়েছে আমাদেরও তাই হবে। সমুদ্রের দানো উঠেছে, আমি তো আগেই বলেছিলাম!

তার কথায় উত্তর দিলাম না। সামনের দিকে তখন দেখছিলাম, কালো সমুদ্র সবুজ করে বহু দূর থেকে এই সামুদ্রিক নেকড়ের পাল আসছে। তাদের আসা সম্বন্ধে একটা আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, ঠিক শিক্ষিত সৈন্যের মত সার বেঁধে ছাড়া তারা চলে না। মাছের ঝাঁক অনেক সময়ে একসঙ্গে চলে কিন্তু তাদের ভেতর এমন শৃঙ্খলা নেই। এদের প্রত্যেক সারে একটির বেশি ছুটি প্রাণী পাশাপাশি নেই। কেউ কাউকে এগিয়েও যায় না। দূর থেকে দেখলে মনে হয়, যেন প্রকাণ্ড একটা সাপ সমুদ্রের ভেতর দিয়ে আসছে; তবে এঁকেবেঁকে নয়, একেবারে তীরের মত সোজা।

এর মধ্যে লঞ্চ এতটা হেলেছে যে আরেকটু বাদেই সমুদ্রের জল ডেকএর ওপর উঠবে। সারেঙও ভীত হয়ে রমানাথবাবুর আদেশ না নিয়েই লঞ্চ চালাবার চেষ্টা করলে, কিন্তু নিচের ক্রু তখন ভাল করে আর জল পায় না। লঞ্চ কাত হয়ে এগুতে গিয়ে আরো বেশি জল ডেকএ ওঠবার সম্ভাবনা হল।

আমি ভয়ে একরকম উন্মত্ত হয়ে রমানাথবাবুর কাছে গিয়ে চিৎকার করে বললাম, লঞ্চ যে ডোবে, তা দেখতে পাচ্ছেন?

ভয়ে আমার বুদ্ধি বিবেচনা লোপ পেয়েছিল। এমনকি এই বিপদের ভেতর আনবার জন্যে রমানাথবাবুর ওপর রাগই হচ্ছিল। তিনি কিন্তু অবিচলিত ভাবে আমার দিকে ফিরে জলের একদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, দেখতে পেয়েছ?

সারেঙের ফেলা তেলটা ভাসছে ছাড়া আর কিছুই কিন্তু আমি দেখতে পেলাম না। বিরক্ত হয়ে বললাম, আপনি পাগল হয়ে গেছেন। লঞ্চ ডুবছে তা খেয়াল আছে?

রমানাথবাবু এবার বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকে উঠে ডাকলেন, সারেঙ!

সারেঙ কাছেই ছিল। শুকনো মুখে বললে, আর আশা নেই বাবু!

সে কথায় কান না দিয়ে রমানাথবাবু পাগলের মত জিজ্ঞাসা করলেন, কত পেট্রল আছে স্টোর-রুমে?

সারেঙ আমারই মত অবাক হলেও উত্তর দিলে, তা অনেক আছে বাবু, তুদিনের যাওয়া-আসার মত তেল কেনা হয়েছিল।

শিগগির সব বার করে নিয়ে এসে লঞ্চের চারধারে ঢালো! শুধু ফিরে যাবার মত তেল থাকলেই চলবে।

রমানাথবাবুর কথা বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে তাঁর দিকে চাইতেই তিনি আবার জলের দিকে আমাকে তাকাতে বলে বললেন, এখনও বুঝতে পারো নি? আমাদের চারধারে সব জল সবুজ হয়ে গেছে, কিন্তু ওখানটায় কিছু দেখতে পাচ্ছ? সত্যিই সমস্ত জায়গা সেই প্রাণীর ভিড়ে সবুজ হয়ে গেলেও সেই তেলটুকু যতখানি জায়গা জুড়ে ভাসছিল তার ত্রিসীমানায় সবুজ রঙের আভাস ছিল না।

লঞ্চ তখন একেবারে হেলে পড়ে একদিকের ডেক জলের প্রায় সমান-সমান হয়ে পড়েছে। তাড়াতাড়ি আমি রমানাথবাবুকে টেনে না নিলে একটা জানোয়ার মুলো বাড়িয়ে আর একটু হলে তাঁকে ধরে ফেলেছিল আর-কি! খালাসিরা রমানাথবাবুর আদেশের তাৎপর্য না বুঝলেও ইতিমধ্যে চারধারে পেট্রোল ঢালতে শুরু করেছে। কিন্তু তাতে যে কিছু হবে আমার আশা ছিল না। পরমুহূর্তেই আমাদের চোখের ওপর যে ব্যাপার ঘটল তাতে আশা হারানো অস্বাভাবিকও নয়। একজন জেলে তেল ঢালবার জন্যে রেলিঙের একটু বেশিরকম কাছে এগিয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ তার চিৎকার শুনে দেখি, তু-তিনটে জানোয়ার তাদের চাবুকের মত মুলো দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরেছে। আমরা তার সাহায্যে যেতে-না-যেতেই তারা তাকে চক্ষের নিমেষে টেনে একেবারে জলের

তলায় নিয়ে গেল। লোকটা একবারের বেশি চিৎকার করবার অবসরও পেল না। কিছুক্ষণ বাদে আমাদের সকলেরই ঐ দশা হবে জেনে গভীর হতাশায় আমি মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হলাম।

কিন্তু সেদিন প্রাণ নিয়ে অক্ষত শরীরে কক্সবাজারে ফিরেছিলাম। না ফিরলে এই গল্প তোমাদের শোনাতে পারতাম না। সেদিন বেঁচে গিয়েছিলাম শুধু রমানাথবাবুরই বুদ্ধিতে, সে কথা আজ কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করছি। চারধারে পেট্রল ঢালার সঙ্গে সঙ্গে জাদুমন্ত্রের মত কী করে যে সেই ভীষণ সামুদ্রিক মাকড়ের পাল সরে গেল, তখন তা বুঝতে পারিনি। স্টীমার একটু সোজা হতেই সারেঙ সেদিন প্রাণপণে ইঞ্জিন চালিয়ে প্রাণ বাঁচায়।

রমানাথবাবু নিজে পরিত্রাণ পেয়ে ফিরে এসেই অবশ্য নিশ্চিন্ত হননি। তাঁরই চেষ্টায় ও পরামর্শে অনেক গড়িমসির পর শেষ পর্যন্ত কক্সবাজারের পুলিশ রাজি হয়ে কয়েকটি জলে তেল ছড়াবার স্টীমার পাঠাবার ব্যবস্থা করে। ঝড়ের সময় যেমন করে কোন-কোন জাহাজ চারিধারে তেল ছড়ায় তেমনি করে ঐ ভয়ঙ্কর প্রাণীর বিচরণ-ক্ষেত্র জুড়ে কয়েকদিন ধরে তেল ছড়ানো চলে। তার ফলে আশ্চর্যভাবে কয়েকদিনের ভেতর তারা অন্তর্ধান করেছে। কক্স-বাজারে এখনও সামুদ্রিক মাছ দুষ্প্রাপ্য, কিন্তু আশা করা যায় আর-বছরের ভেতর আবার আগেকার দিন ফিরে আসবে।

কয়েকদিন বাদে রমানাথবাবুকে এই অদ্ভুত সামুদ্রিক প্রাণীর রহস্য পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলবার জন্যে অনুরোধ করলাম। তিনি বললেন, ব্যাপারটা খুবই আশ্চর্য বটে, কিন্তু সমুদ্র নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন তাঁরা অনেকদিন আগেই এমন ঘটা যে সম্ভব তা অনুমান করে রেখেছেন। সামুদ্রিক যে-সব জীবজন্তুর মানুষ এ পর্যন্ত সন্ধান পেয়েছে সেগুলো সমুদ্রের অপেক্ষাকৃত ওপরের স্তরের। কিন্তু সমুদ্রের গভীর তলায় যে কী আছে মানুষ তার কিছুই জানে

না। সমুদ্রের তলা তো বড় কম কথা নয়! হিমালয়ের সবচেয়ে উঁচু শৃঙ্গটিকে উল্টো করে যদি জলে ডুবিয়ে দেওয়া যায় তাহলেও তল পাওয়া যায় না—এমন গভীর সমুদ্রও আছে! সেখানে মানুষের কোন জালই পৌঁছয় না। আর যদি বা পৌঁছত তাহলেই বা হত কী? সমুদ্রের এপর্যন্ত মানুষ কতটুকু আর খুঁজে দেখেছে। বৈজ্ঞানিকরা তাই অনেকদিন আগেই অনুমান করেছেন, সমুদ্রের গভীর স্তরে এদের বাস। এরা এতদিন ওপরে ওঠেনি বলেই মানুষ এদের পরিচয় পায়নি। এদের সম্বন্ধে সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে এদের বুদ্ধি আর শৃঙ্খলা। সমুদ্রের তলার কোন প্রাণী যে এতখানি বুদ্ধি, এরকম দলবদ্ধ হওয়ার ক্ষমতা দেখাতে পারে, একথা কেউ ভাবে নি। জেলেদের নৌকো ওল্টানোর ব্যাপার থেকেই এদের অসামান্য বুদ্ধির আমি পরিচয় পাই। সার বেঁধে আক্রমণ করার শৃঙ্খলা তো তুমিও দেখেছ!

বললাম, আমাদের লঞ্চও তো উল্টোতে বসেছিল, কিন্তু কী করে, তা এখনো বুঝতে পারিনি।

—এমন কিছু শক্ত কাজ তো নয়, শুধু একটা সামুদ্রিক প্রাণীর মাথায় এসেছে এইটেই আশ্চর্য। নৌকো ও আমাদের লঞ্চের তলার মেরু-দণ্ডে শুলো জড়িয়ে এদের গোটাকতক প্রাণী একদিকে টানবার চেষ্টা করলেই তো কাত হয়ে পড়বে। কাত হবার পর সামনে থেকে শুলো জড়িয়েও নিচে টানা যায়। একটু কাত হলেই জল উঠে ওল্টাতে কতক্ষণ? অবশ্য এতে ভীষণ শক্তিরও দরকার।

জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু এরা হঠাৎ নিচের স্তর ছেড়ে ওপরেই বা উঠল কেন?

রমানাথবাবু বললেন, প্রথমে আমিও তা ভেবে ঠিক করতে পারিনি। তারপরেই মনে পড়ে গেল যে কিছুদিন আগে কাছাকাছি সমুদ্রের তলায় এক জায়গায় ভীষণ ভূমিকম্প হয়ে গেছে, সেই আলোড়নেই, হয়ত কেন, নিশ্চয়ই এরা স্থানচ্যুত হয়ে ছিটকে

এসে পড়েছে। এসে প্রথম তো এদিকের সমুদ্রের মাছ অর্ধেক খেয়ে সাবাড় করেছে। বাকি অর্ধেক এদের ভয়ে এ তল্লাট ছেড়ে পালিয়েছে। মাছের যখন অভাব তখন ক্ষিদের জ্বালায় এদের নজর গেছে মানুষের ওপর এবং তার জন্যে বুদ্ধি যা খাটিয়েছে তা অপূর্ব। দৈব পথ না দেখালে এতদিনে আমরাও তাদের পেটে হজম হয়ে যেতাম। সারেঙ যদি সেই সময় জলে ময়লা তেল না ফেলত, আমার যদি সেইদিকে চোখ না পড়ত, তাহলে আমরা তো মারা যেতামই, আরো কী সর্বনাশ মানুষের যে ঐ জীব থেকে হত কে জানে! সামান্য পেট্রলের তেল কেন যে ওদের অসহ্য তা এখনো ভালো করে বুঝি না, এবং দৈব সহায় না হলে শুধু বিজ্ঞানের সাহায্যে ও-ওষুধের সন্ধান কখনো পেতাম কি না সন্দেহ।

আমি বললাম, এসব তো বুঝলাম, কিন্তু জেলে-সর্দার রাত্রে সমুদ্রে যে আলোর কথা বলেছিল সেটা নিশ্চয়ই মিথ্যা কথা?

রমানাথবাবু হেসে বললেন, সেটা সম্পূর্ণ সত্যি। রাত্রে যে আলো জেলেরা দেখেছিল সে এই প্রাণীগুলিরই গায়ের আলো এবং এরা যে সমুদ্রের গভীর স্তরের জীব, এই আলোই তার আর-একটা প্রমাণ। সমুদ্রের গভীর তলায় একেবারে অমাবস্যার রাতের মত অন্ধকার। সূর্যের আলো জলের রাশি ভেদ করে অতদূর পৌঁছতে পারে না। সেখানে যেসব প্রাণী থাকে, প্রকৃতির আশীর্বাদে তাই তাদের আলো তাদের নিজেদের দেহ থেকেই বার করবার ক্ষমতা পেয়েছে।

খানিক চুপ করে থেকে রমানাথবাবু আবার বললেন, আমরা এই দেখেই আশ্চর্য হচ্ছি, কিন্তু এই অসীম অতল সমুদ্রের ভেতর আরো কত রহস্যময় প্রাণী আছে কে জানে। পৃথিবীর তিনভাগের একভাগ স্থলে যদি মানুষের মত বুদ্ধিমান জীবের উদ্ভব সম্ভব হয়, তাহলে এই বিশাল জলের জগতে নতুন ধরনের বুদ্ধিমান কোন জীবের সৃষ্টি সম্ভব হবে না কে বলতে পারে!

পৃথিবীর শত্রু

মাত্র দশ বছরের একটি মেয়ের মৃত্যুর ফলে একদিন পৃথিবীর নিদারুণ সর্বনাশ হতে বসেছিল বললে কেউ যে বিশ্বাস করবে না তা জানি। কিন্তু আসন্ন যুদ্ধ থেকে দুটি দেশের অসংখ্য মানুষকে যিনি রক্ষা করেছিলেন অসাধারণ বুদ্ধি ও দূরদৃষ্টির বলে, তাঁর কাহিনী শুনলে এ বিষয়ে তোমাদের কোন সন্দেহ বোধহয় থাকবে না।

* * *

তোমরা বোধহয় জানো দক্ষিণ আমেরিকার রাজ্যগুলির মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ লেগেই আছে। একসঙ্গে গোটাকতক পায়রাকে এক জায়গায় পুরে রাখলে তারা যেমন পরস্পরের মধ্যে মারামারি না করে পারে না, দক্ষিণ আমেরিকার রাজ্যগুলিও তেমন। শান্তি সেখানে একেবারে নেই বললেই হয়। একটা-না-একটা গণ্ডগোল চলছেই। ছোট ছেলেদের মত তাদের ভাব-আড়ির কোন মানে নেই। আজ হয়ত দেখছ কলাম্বিয়া আর ভেনজুয়েলাতে গলাগলি—দুজনে জোট পাকিয়ে তারা ব্রেজিলের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে; আবার কালই হয়ত দেখতে পাবে কলাম্বিয়া ভিড়ে গেছে ব্রেজিলের দলে আর ভেনজুয়েলার সঙ্গে সম্পর্ক তার একেবারে আদায়-কাঁচকলায়। কোনদিন যে দু-রাজ্যের মুখ-দেখাদেখি ছিল এমন কথা মনে হবে না। রাজ্য-গুলির ভেতরেও কম গোলমাল চলে না। সকালবেলা উঠে একদিন দেখলে শহরের চেহারা বদলে গেছে—সরকারি বাড়ির গম্বুজের ওপর কালো পতাকা উড়ছে। ব্যাপার কী? ব্যাপার

আর কী,—কাল রাত্রের অন্ধকারের ভেতর প্রেসিডেন্ট ভন নোভারোর ফাঁসি হয়ে গেছে আর তাঁর জায়গায় নতুন প্রেসিডেন্ট হয়েছেন সেনর সেবাটিনি। সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় রাস্তায় প্রহরীদের পোশাক বদলেছে, সৈন্যদের মাথার উষ্ণীষ হয়েছে নতুন রকম। তুমি হয়ত সাধারণ মানুষ—ব্যবসা করে খাও কি দোকানদারি বা চাকরি কর—ভাবলে, যে রাজা হয় হোক বাপু, দুদিন শান্তিতে বাস করতে পারলে বেঁচে যাই। রাজায় রাজায় মারামারি তাতে কার কী আসে যায়! কিন্তু সেটি হবার জো নেই! দুদিন যেতে-না-যেতেই হুড়-হুড় করে নগরে নতুন সৈন্যদল প্রবেশ করল। এরা কারা? এরা হচ্ছে বিখ্যাত দস্যু জিঙ্গারোর দল—দেশের দুরবস্থা দেখে দেশবাসীকে উদ্ধার করতে এসেছেন। ব্যস! সাত-দিন ধরে চলল পথে পথে মারামারি কাটাকাটি। নিরীহ লোকের প্রাণান্ত। যে দল যখন জয়ী হয় যা পারে লুট করে নিয়ে যায়। বাড়ি-ঘর ভেঙে তছনছ করে। এমনি করে সাতদিন বাদে যে-পক্ষের ক্ষমতা বেশি সে-ই চড়ে বসল রাজ্যের গদিতে, সুখে স্বচ্ছন্দে শান্তিতে আরো দীর্ঘ তিন দিন রাজত্ব করবার জন্যে।

ভেতরের অবস্থা যাদের এমনি তারা যে পাড়াপড়শির সঙ্গে কী-রকম সৌহার্দ্য সূত্রে আবদ্ধ হয়ে বাস করে তা বোধহয় বুঝতে কষ্ট হবে না। রাজ্যগুলি যে-যার বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে পরস্পরকে নিয়তই চোখ রাঙাচ্ছে,—সুযোগ পেলেই কাটাকাটি করতে কারুর বাধে না।

এসব ছোট-খাট ব্যাপার। কিন্তু সেবার আর্জেন্টিনা আর উরু-গুয়ের মধ্যে যে যুদ্ধ বাধবার উপক্রম হয়েছিল সেটা অত্যন্ত সাঙ্ঘাতিক রকমের। সীমান্ত নিয়ে সামান্য দাঙ্গা-হাঙ্গামায় এ ব্যাপার শেষ হবে না বলে সবাই বুঝতে পেরেছিল—কারণ ভেতরের ব্যাপার অত্যন্ত জটিল।

সেদিন আর্জেন্টিনা গণতন্ত্রের মন্ত্রণাসভার বৈঠকে উরুগুয়ের

ব্যাপারেরই আলোচনা হচ্ছিল। বাইরে বহু লোক এই সভার শেষ সিদ্ধান্ত জানবার জন্যে তখন উদ্‌গ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। উরুগুয়ের সঙ্গে যুদ্ধঘোষণা করা হবে কি না এই সভাতেই তা স্থির হবার কথা।

বৈঠক অবশ্য গোপনে বসেছিল, সাধারণের তাতে প্রবেশের অধিকার নেই। সভার কাজ প্রায় অর্ধেক অগ্রসর হয়ে এসেছে, যুদ্ধসচিব ডন পেরিটো সামান্য উরুগুয়ের মত একটা রাজ্যের স্পর্ধা কিছুতেই যে সহ্য করা উচিত নয় সেই কথা জ্বলন্ত ভাষায় বুঝিয়ে দিয়েছেন। সভার ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে যুদ্ধের সপক্ষেই অধিকাংশ সভ্য রায় দেবেন। এমন সময় সভাগৃহের দরজায় একটা গোলমাল শোনা গেল। ব্যাপার আর কিছু নয়, বাইরে থেকে একজন সভায় প্রবেশ করতে চায়, অথচ প্রহরী তাকে ছাড়বে না।

আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রপতি সেদিন অনুপস্থিত ছিলেন অসুস্থতার জন্যে। সভাপতিত্ব করছিলেন তাঁর সহকারী। গোলমাল শুনে তিনি প্রহরীকে ডেকে পাঠালেন। প্রহরী এসে তাঁর হাতে এক টুকরো কাগজ দিয়ে জানালে, খোদ রাষ্ট্রপতির সই করা একটা প্রবেশপত্র নিয়ে একটি লোক মন্ত্রণাসভায় ঢুকতে চায়: কিন্তু গোপন মন্ত্রণাসভায় এরকম ভাবেও কাউকে ঢুকতে দেওয়া নিয়মবিরুদ্ধ বলে সে আপত্তি করছিল।

সহকারী রাষ্ট্রপতির চিঠিটা পড়ে দেখলেন। রাষ্ট্রপতি লিখেছেন—যে লোকটি এই চিঠি নিয়ে যাচ্ছেন, উরুগুয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণার ব্যাপারে তাঁর কিছু বলবার আছে। লোকটির কথাবার্তা শুনে আমার মনে হয়েছে তাঁর কথা একেবারে অবহেলার যোগ্য নয়। আমি শারীরিক অত্যন্ত অসুস্থ না হলে নিজেই এঁকে নিয়ে যেতাম। নিয়মবিরুদ্ধ হলেও আমি আপনাদের সভায় যোগদান করবার অধিকার এঁকে দিলাম।

এঁর নাম সেনর আলভারো—ইনি সরকারি কৃষিবিজ্ঞানের একজন বৈজ্ঞানিক।

সহকারী রাষ্ট্রপতি প্রহরীকে এবার আগন্তুক বৈজ্ঞানিককে ভেতরে নিয়ে আসবার অনুমতি দিলেন। প্রহরীর সঙ্গে তিনি যখন প্রবেশ করলেন তখন দেখা গেল. আলভারোর বয়স বেশি নয়। প্রবীণ বিজ্ঞ মন্ত্রীদের সভায় তাঁর মত একজন যুবক বৈজ্ঞানিকের কী বলবার থাকতে পারে কেউ ভেবে পেল না। যুদ্ধসচিব সভার কাজে বাধা পড়ায় সবচেয়ে বেশি বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। তিনি একটু ব্যঙ্গ করেই বললেন, যুদ্ধ সম্বন্ধে আপনার কৃষিবিজ্ঞান কিছু বলে নাকি?

আলভারো হেসে বললেন,—বলে যে, উরুগুয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করা যেতে পারে না।

ডন পেরিটো রেগে উঠে বললেন, কেন? কেন পারে না? তাদের দেশের লোক গত তিন মাসে বহুবার আমাদের সীমান্ত আক্রমণ করেছে, সমস্ত লুটপাট করে নিয়ে গেছে। জানেন, আমাদের সীমান্তের সৈন্যদের রসদ পর্যন্ত তারা চুরি করে নিয়ে গেছে? উরুগুয়ের সরকারের কাছে আমরা ক্ষতিপূরণের জন্যে বার বার তিনবার দাবি করেছি কিন্তু তারা কোন উত্তর দেয়নি জানেন?

আলভারো শান্তভাবে বললেন, তাদের সরকারেরও এতে দোষ নেই। তাদের দেশে দুর্ভিক্ষ; খাদ্য-অভাবে মানুষ উন্মাদ হয়ে যা করেছে তার দোষ তাদের রাজ্যের ওপর চাপানো উচিত নয়।

এবার সহকারী রাষ্ট্রপতি উত্তর দিলেন, কিন্তু আমাদের নিজেদের প্রজাদের প্রতি তো আমাদের কর্তব্য আছে। তাদের শস্য পরে লুটপাট করে নিয়ে যাবে আর আমরা কিছু করব না? উরুগুয়েতে দুর্ভিক্ষ হয়ে থাকে, তাদের সরকার তা দূর করার

চেষ্টা করুক। সেই দুর্ভিক্ষের জন্যে তারা আমাদের প্রজাদের জিনিসপত্র লুটপাট করলে আমরা ক্ষতিপূরণের দাবি করব না কেন?

আলভারো গম্ভীরভাবে বললেন, কিন্তু ক্ষতিপূরণের দাবি যে তাদেরই করবার কথা!

সমস্ত সভা এ কথায় স্তম্ভিত হয়ে গেল। ডন পেরিটো হঠাৎ হেসে উঠে বললেন, আপনি পাগল হয়েছেন! তারা আমাদের জিনিসপত্র লুটে নেবে, আবার ক্ষতিপূরণের দাবিও করবে!

আলভারো গম্ভীরভাবে বললেন, হুঁ। সব কথা জানলে তারা তাই করত।

সহকারী রাষ্ট্রপতিরও এবার সন্দেহ হচ্ছিল যে আলভারোর মাথা হয়ত ঠিক নেই। তিনি হেসে বললেন, সব কথা আপনিই বলুন না, কী!

—তাদের দুর্ভিক্ষের জন্যে আমরাই দায়ী।

সকলে সমস্বরে বলে উঠল, আমরাই দায়ী!

—হ্যাঁ, আমরাই দায়ী। উরুগুয়ের গোটাকতক লোক আমাদের সীমান্ত থেকে সামান্য কিছু শস্য লুট করে নিয়ে গেছে মাত্র। কিন্তু আমরা তাদের সমস্ত রাজ্যের অন্ন মেরে দিয়েছি—হাজার হাজার লোককে অনাহারে থাকতে বাধ্য করেছি।

—কী রকম?

আলভারো ধীরভাবে বললেন, আমায় সাতদিন সময় দিন, আমি সমস্ত প্রমাণ আপনাদের হাতে এনে দেব। আমায় বিশ্বাস করুন, সাতদিনে এমন কিছু এসে যাবে না। তাদের দেশের দারুণ দুর্ভিক্ষের কথা ভেবে যুদ্ধ ঘোষণার পূর্বে আর সাতদিন সময় তাদের দেওয়া উচিত। ভেবে দেখুন, যুদ্ধ একবার আরম্ভ হলে সহজে থামবে না—বহু লোকের অকারণে প্রাণ যাবে।

তাঁর কথায় বাধা দিয়ে ডন পেরিটো অত্যন্ত রেগে উঠে সভার সকলকে উদ্দেশ করে বললেন, আমরা কি এখানে একটা পাগলের

প্রলাপ শুনতে এসেছি ? একটা পাগলের কথায় কি আমরা উরুগুয়ের অপমান নিঃশব্দে, বিনা প্রতিবাদে সহ্য করে থাকব ?

সভার লোক চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। আলভারো গম্ভীর স্বরে বললেন, আপনারা যদি অকারণে যুদ্ধ করবার জন্যে লালায়িত হয়ে থাকেন তাহলে আমার আর কিছু বলবার নেই, কিন্তু আপনারা যদি ন্যায় বিচার করতে চান তাহলে আর সাতদিন সময় আপনাদের আমায় দেওয়া উচিত। সাতদিন বাদে যদি আপনারা বোঝেন যে সত্যিই আমরা উরুগুয়ের দুর্ভিক্ষের জন্যে দায়ী নই তাহলে আপনারা অনায়াসে যুদ্ধঘোষণা করতে পারেন।

ডন পেরিটো রাগে ফুলছিলেন। বললেন, উরুগুয়েকে সাত-দিন সময় দিতে চাওয়ার ভেতর আপনার অন্য উদ্দেশ্য নেই কে বলতে পারে ? কে জানে আপনি উরুগুয়ের গুপ্তচর কি না ?

এত বড় অপমানের কথাতেও অবিচলিত ভাবে আলভারো বললেন, এ অপমানের প্রত্যুত্তরে আপনাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করাই আমার উচিত ছিল ডন পেরিটো। কিন্তু আপনার মত লোকের প্রাণ নেওয়ার চেয়ে অনেক দামি কাজ আমার হাতে। সাতদিন আমার সময় হবে না। তারপর আপনি যেদিন খুশি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারেন।

আলভারোর এই অবিচালিত ভাব দেখেই সভার লোকের বোধহয় তাঁর ওপর একটু শ্রদ্ধা জন্মেছিল। সহকারী রাষ্ট্রপতি শুধু একবার বললেন, তাদের দুর্ভিক্ষের জন্যে দয়া করে যুদ্ধ বন্ধ রাখতে আমরা পারি না। কারণ, অবস্থা আমাদেরও ভাল নয়। গত দু-বছর আমাদের বনবিভাগের আয় যে একেবারে কমে গেছে তা বোধহয় আপনারা জানেন। তবু সাতদিন সময় আপনাকে আমরা দিচ্ছি। আমরা অবিচার জ্ঞানত করতে চাই না।

আলভারো বললেন, আপনি সমস্যার মূলসূত্র প্রায় ধরে ফেলেছেন।

তাঁর এ হেঁয়ালি অবশ্য কেউ বুঝতে পারল না।

সাতদিন মাত্র সময়। এই সাতদিন বাদেই দুটি রাজ্যের ভবিষ্যৎ স্থির হয়ে যাবে। উরুগুয়ে ও আর্জেন্টিনার ভেতর গত পাঁচ বছর কোন গোলমাল হয়নি। কিন্তু একবার আরম্ভ হলে অবস্থা যে কীরকম দাঁড়াবে তা বোঝা শক্ত নয়। সেই ভীষণ অবস্থা সহজে কেউ কামনা করে না। অন্যান্য সহকারী কর্মচারীরা তাই ধৈর্য ধরে আলভারোর কথায় সাতদিন অপেক্ষা করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। অকারণে যুদ্ধ করতে তাঁরা চান না। কিন্তু ডন পেরিটোর আর সবুর সইছিল না। আলভারোর সমস্ত কথাই তাঁর গাঁজাখুরি গল্প বলে মনে হচ্ছিল। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস আলভারো উরুগুয়ের একজন গুপ্তচর, উরুগুয়েকে সময় দেবার জন্যেই তিনি এই ফিকির করেছেন। আলভারোর গতিবিধি লক্ষ্য করবার জন্যেই তিনি তার পেছনে নিজে থেকে এক চর লাগিয়ে দিলেন।

কিন্তু প্রথম দিন চরের মুখে যে সংবাদ পাওয়া গেল তাতে তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন। আলভারো সারাদিন তাঁর পরীক্ষাগার থেকে মোটেই বার হন নি। সকালে সংবাদ পাওয়া গেল গভীর রাত্রি পর্যন্ত তিনি সেখানে ছিলেন। দ্বিতীয় দিন সংবাদ পাওয়া গেল যে আলভারো বাইরে বেরিয়েছিলেন একবার কিন্তু সে শুধু হাওয়া-আপিসে গত চার বছরের আবহাওয়ার বিবরণ দেখবার জন্যে।

ডন পেরিটোর গুপ্তচর সেদিন গোপনে আলভারোর ঘরের কাগজপত্র তাঁর অনুপস্থিতিতে ঘেঁটে এসে জানালে যে আর্জেন্টিনা ও উরুগুয়ের গোটাকতক মানচিত্র ও বৈজ্ঞানিক কিছু বই ছাড়া সেখানে কিছু নেই। ডন পেরিটো কিছুই বুঝতে না পেরে অস্থির হয়ে উঠলেন।

তৃতীয় দিন আলভারোকে দেখা গেল আর্জেন্টিনার সবচেয়ে বড় খবরের কাগজের আপিসে। তিনি নাকি পনেরো বছর

আগেকার খবরের কাগজের ফাইল ঘাঁটছেন। সেদিন রাত্রে তাঁকে মোটরে করে বন-বিভাগের বড় কর্মচারী বৃদ্ধ ফস্‌-এর সঙ্গে বেড়াতেও দেখা গেল। হঠাৎ বৃদ্ধ ফস্‌-এর সঙ্গে তাঁর এত আলাপের কী কারণ থাকতে পারে ডন পেরিটো কিছুই বুঝতে পারলেন না।

এ পর্যন্ত আলভারো যে উরুগুয়ের গুপ্তচর তা প্রমাণ করবার মত কোন সুযোগ পেরিটো অবশ্য পান নি। কিন্তু তাঁর সন্দেহ যায় নি। ভেতরে ভেতরে অন্যান্য মন্ত্রীদের তিনি এই পাগলের কথা না শুনে তাড়াতাড়ি যুদ্ধঘোষণা করবার জন্যে উত্তেজিত করবার চেষ্টা করছিলেন।

চতুর্থ দিন তাঁর সুযোগও মিলে গেল। সেদিন সীমান্ত থেকে যে সংবাদ এল তা ভয়ানক। উরুগুয়ের প্রায় শ-পাঁচেক লোক একেবারে পারানা নদের ধার পর্যন্ত এসে বিস্তর শস্য ও অন্যান্য জিনিস লুট করে নিয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, এবার তাদের আক্রমণের যারা প্রতিরোধ করতে গেছল তাদের দুজনকে তারা মেরেও ফেলেছে।

এ পর্যন্ত এই লুটপাটে আর্জেন্টিনার কোন লোক মারা যায় নি। সুতরাং এই নরহত্যার সংবাদে দেশের লোক ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠল। রাষ্ট্রপতি সুস্থ হয়েছিলেন, তিনি তাড়াতাড়ি এক সভার আয়োজন করলেন। আলভারোর ডাক পড়ল সেখানে।

রাষ্ট্রপতি তাঁকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন যে আর তাঁরা অপেক্ষা করতে পারেন না। উরুগুয়ের স্পর্ধা এইবার দমন না করলে আরো বেড়ে যাবে। আলভারোর যা প্রমাণ দেবার আছে এখনই যেন তিনি তা দেন।

আলভারো একগাদা কাগজপত্র সঙ্গে এনেছিলেন। ধীরভাবে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, আমার প্রমাণ তৈরি।

ডন পেরিটো কিন্তু উত্তেজিতভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, কী

হবে আমাদের প্রমাণে? আর্জেন্টিনার যে দুজন নিরীহ প্রজার প্রাণ গেল তাদের প্রাণ কি এই প্রমাণে ফিরে পাওয়া যাবে?

আলভারো এবার ব্যঙ্গের স্বরে বললেন, যুদ্ধ বাধিয়ে আরো হাজার হাজার লোকের প্রাণ নষ্ট করলেই কি তা ফিরে পাওয়া যাবে?

রাষ্ট্রপতি এবার একটু বিরক্ত হয়েই বললেন, তবে আপনি কী করতে বলেন?

—আমি বলি প্রথমে এই মুহূর্তে আর্জেন্টিনার একটি লোককে গ্রেপ্তার করতে।

সমস্ত সভা স্তব্ধ। ডন পেরিটো কি ভেবে উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। আলভারো হেসে বললেন, না মসিয়েঁ পেরিটো, আপনাকে নয়। আমি গ্রেপ্তার করতে বলি বনবিভাগের বড় কর্তা মসিয়েঁ ফস্-কে।

সমস্ত সভার ওপর দিয়ে যেন একটা ঝড় বয়ে গেল। রাষ্ট্রপতি খানিক বাদে গম্ভীর স্বরে বললেন, আমি এখন দেখছি ডন পেরিটোর কথা মিথ্যা নয়। আপনি সত্যিই উন্মাদ! জানেন, মসিয়েঁ ফস্ সমস্ত আর্জেন্টিনার গৌরব! মাইক্রলজির গবেষণায় সমস্ত ইয়োরোপেও তাঁর জুড়ি নেই জানেন? এই ষাট বছরের বৃদ্ধ বিজ্ঞান-তপস্বীকে আপনি গ্রেপ্তার করতে বলেন!

শান্তভাবে আলভারো বললেন, আমি তাই বলি। আপনি যা বলবেন আমি সবই জানি এবং তার চেয়ে কিছু বেশি জানি। মসিয়েঁ ফস্ অসাধারণ বৈজ্ঞানিক। উদ্ভিদ-জগতের গোপন শত্রু সম্বন্ধে তাঁর গবেষণা সমগ্র পৃথিবীর লোককে স্তম্ভিত করে দিয়েছে; কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি উরুগুয়ের শত্রু, আর্জেন্টিনার শত্রু। সত্যি কথা বলতে কি, সমগ্র মানবজাতির এত বড় শত্রু তাঁর আগে কখনো জন্মায় নি।

ডন পেরিটো দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, বৃদ্ধ ফস্-এর হয়ে আমি আপনাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করছি, আলভারো।

—আপনি স্থির হোন। এটা ছেলেমানুষির সময় নয়। বলে আলভারো তাঁর কাগজপত্র বেছে একটি কাগজ তুলে নিয়ে বলতে আরম্ভ করলেন—

সহকারী রাষ্ট্রপতি সেদিন বলেছিলেন, দু-বছর ধরে আমাদের বন-বিভাগের আয় একদম নেই। তাঁর এই কথার ভেতর কী গভীর অর্থ যে ছিল তা তিনি নিজেই জানতেন না। বনবিভাগের এই বিবরণ থেকে দেখা যাচ্ছে, গত চার বছর ধরে কোন এক অজ্ঞাত কারণে আমাদের সমস্ত জঙ্গলের গাছপালা শুকিয়ে মরে যাচ্ছে। আর্জেন্টিনার দক্ষিণ-পূর্ব কোণের অরণ্য আমাদের প্রধান সম্পদ। সেই বনের কাঠ ও অন্যান্য জিনিস বেচে আমাদের যা আয় হয়, সমগ্র রাজ্যের রাজস্বের তা সমান। কিন্তু এই আয় ধীরে ধীরে কমে আসছে। পাটাগোনিয়ার প্রান্ত থেকে লা প্লাটার বন্দর পর্যন্ত অরণ্যভূমি একেবারে উজাড় হয়ে গেছে। বন-বিভাগের বৈজ্ঞানিকেরা হাজার গবেষণা করেও এর কারণ নির্ণয় করতে পারেন নি।

ডন পেরিটো যেন আর থাকতে না পেরে বললেন, তার সঙ্গে উরুগুয়ের সীমান্ত আক্রমণের কী সম্পর্ক ?

—বলছি, শুনুন। আর-একটি কাগজ তুলে নিয়ে আলভারো বললেন, এটি এখানকার আবহাওয়া বিভাগের বিবরণ। গত চার বছর ধরে আমাদের দেশের হাওয়া একটু একটু করে শুষ্ক হয়ে আসছে। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ক্রমে দেখা যাচ্ছে কম। কিন্তু আমাদের এখানে যদিবা একটু-আধটু বৃষ্টি হয়, উরুগুয়েতে গত দুবছর বৃষ্টি মোটে হয়নি। অ্যাণ্ডিজ পাহাড় আর তার ধারের অরণ্য আর্জেন্টিনাকে কিছু পরিমাণ রক্ষা করেছে, কিন্তু উরুগুয়ে একেবারে মারা পড়েছে।

রাষ্ট্রপতি বললেন, আর-একটু বুঝিয়ে বলুন।

আলভারো বললেন, এর ভেতর কঠিন কিছু নেই। আমাদের দক্ষিণ-পূর্ব আর্জেণ্টিনার অরণ্যই এতদিন সেখানকার আকাশকে আর্দ্র করে রেখেছিল। তারই ফলে সেখানে মেঘ জমত এবং উরুগুয়ের ও আমাদের উত্তর অঞ্চলে বৃষ্টি হত। কিন্তু অরণ্য মরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেঘ আর সেখানে জমছে না। অনাবৃষ্টিতে উরুগুয়ের সমস্ত আবাদ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। দু বছর পর-পর তাদের দেশে অজন্মা হওয়ার মূল হচ্ছে আমাদের এই অরণ্যভূমির বিনাশ। সুতরাং তাদের দুর্ভিক্ষের জন্যে যে আমরা দায়ী এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

একজন সভ্য উঠে কি বলতে যাচ্ছিলেন, তাঁকে বাধা দিয়ে আলভারো বললেন, আপনি যা বলবেন আমি জানি। আমি সেই কথাই এবার বলব। উরুগুয়ের লোকেরা আমাদের সীমান্ত আক্রমণ করবার সময়েই আমি এ সমস্ত কথা বুঝতে পেরেছিলাম। আমাদের জঙ্গলের ওপর তাদের জীবন-মরণ নির্ভর করছে, সুতরাং এ জঙ্গল আমাদের এলাকাভুক্ত হওয়ার দরুন আমরা তা নিয়ে যা খুশি করতে পারি একথা বলা চলে না। তারা অন্নাভাবে যে উন্মাদ হয়ে আমাদের সীমান্ত আক্রমণ করছে তার আসল কারণ এই যে, আমরা আমাদের অরণ্য রক্ষা করতে পারি নি। দোষী আমরাই—কিংবা সত্যি কথা বলতে গেলে দোষী একটিমাত্র লোক—মসিয়েঁ ফস্।

সভার কেউ এবার আর কোন কথা বললে না। আলভারো একটু থেমে বললেন, প্রথম যখন উরুগুয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে আমি বারণ করি তখন আমি শুধু এইটুকুই জেনেছিলাম যে আমাদের দোষে তাদের দেশে দুর্ভিক্ষ হয়েছে। জ্ঞানত হোক অজ্ঞানত হোক, আমাদের দ্বারা যাদের এত সর্বনাশ হয়েছে তাদের আবার উল্টে আঘাত দেওয়া আমার তখন উচিত মনে

হয়নি। কিন্তু এই চার দিন অনুসন্ধানের ফলে আমি আরো অনেক নতুন কথা জানতে পেরেছি। আমি জানতে পেরেছি যে মসিয়েঁ ফস্-ই আমাদের অরণ্যসম্পদ নষ্ট করছেন ; শুধু তাই নয়, তিনি যে চক্রান্ত করেছেন তা সফল হলে সমস্ত পৃথিবীর সর্বনাশ হবে। পৃথিবীতে কোথাও কোন অরণ্য আর থাকবে না।

ডন পেরিটো উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আপনি প্রমাণ করতে পারেন ?

—না পারলে আমি এখানে দাঁড়িয়ে কথা কইতে সাহস করতাম না। আমাদের জঙ্গলের সমস্ত গাছ কিসে নষ্ট হয়ে গেছে জানেন ? স্বাভাবিক দৃষ্টিতে দেখা যায় না এমনি এক সূক্ষ্ম ফাংগাস (Fungus) নিঃশব্দে আমাদের জঙ্গলের সমস্ত গাছের মজ্জায় মজ্জায় ঘুন ধরিয়ে দিয়েছে বলে। আমার পরীক্ষাগারে এলে এখনি অনুবীক্ষণের সাহায্যে আমি আপনাদের তা দেখিয়ে দিতে পারব। গত দশ বছর গোপনে গোপনে এই অদৃশ্য শত্রু আমাদের সর্বনাশ করছে এবং এ শত্রুকে সৃষ্টি করেছেন ও সাহায্য করেছেন আমাদেরই সহকারী কর্মচারী মসিয়েঁ ফস্। এই মুহূর্তে আপনারা যদি তাঁকে গ্রেপ্তার করে তাঁর বাড়ি ও পরীক্ষাগার খানাতল্লাস করেন তাহলে কীভাবে তিনি পাঁচ বছরের সাধনায় এই অজর অমর উদ্ভিদ-শত্রু আবিষ্কার করেছেন, কীভাবে তিনি নিজের ক্ষমতার সুযোগ নিয়ে অরণ্যের বিনাশে তা প্রয়োগ করছেন তার সমস্ত বিবরণ পাবেন। মসিয়েঁ ফস্ মানুষের শত্রু হলেও তাঁর বৈজ্ঞানিক স্বভাব ছাড়তে পারেন নি। সমস্ত বিবরণ, তাঁর কাজের পরিচয় তাঁর পরীক্ষাগারে লিপিবদ্ধ আছে। এই জাতীয় ফাংগাস তিনি কীভাবে পরীক্ষাগারে লালন করছেন তাও আপনারা দেখতে পাবেন। শুধু যে বৈজ্ঞানিক স্বভাব ছাড়তে না পারার দরুনই মসিয়েঁ ফস্ সমস্ত বিবরণ লিখে রেখেছেন তা নয়, তাঁর এ ষড়যন্ত্র এমন অদ্ভুত, বিজ্ঞানের ছদ্মবেশে এমনভাবে

ঢাকা যে, কোনদিন তা কেউ সন্দেহ করতে পারে এ কথা তাঁর মনে হয়নি। নিরীহ একজন মাইক্রলজিস্ট সমস্ত পৃথিবীর সর্বনাশ করছেন, একথা কে ভাববে !

মন্ত্রণাসভার অধিকাংশ সভ্যই বিজ্ঞানের ধার তেমন ধারেন না। তবু আলভারোর কণ্ঠে সত্যের এমন একটা দৃঢ় সুর ছিল যে সকলেরই মন তাতে টলেছিল। ডন পোরিটো পর্যন্ত এবার চুপ করে ছিলেন।

রাষ্ট্রপতি খানিক চিন্তা করে বললেন, মসিয়ে ফস্-কে নাহয় বন্দী করা গেল। কিন্তু উরুগুয়ে সম্বন্ধে আমাদের কী কর্তব্য ? আর আমাদের অরণ্যকেও আমরা কীভাবে বাঁচাতে পারি ?

আলভারো বসে পড়েছিলেন, আবার উঠে বললেন, উরুগুয়ের সরকারি তহবিলে টাকা নেই। আমি শুনেছি তারা দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের দুর্দশা দূর করবার জন্যে নানা জায়গায় টাকা ধার করবার চেষ্টা করছে। আমি সত্যিই এসব কথা স্বীকার করে উরুগুয়েকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কিছু দিতে আপনাদের বলি না, কিন্তু ঋণস্বরূপ কিছু এখন আর্জেন্টিনা তাকে দিতে পারে। আমার বিশ্বাস, দুর্ভিক্ষের দুর্দশা দূর হলেই তারা আমাদের সীমান্ত আক্রমণ আর করবে না। আর অরণ্য রক্ষা সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই, যেসব জঙ্গলে ইতিমধ্যে এই ঘুন ধরেছে সেগুলি আর রক্ষা করা যাবে না। বরঞ্চ আগুন লাগিয়ে তাদের জ্বালিয়ে দেওয়াই ভালো। না দিলে সংক্রামক ব্যাধির মত এই রোগ অন্য জঙ্গলও নষ্ট করে দেবে। যেসব জঙ্গল এখনো আক্রান্ত হয়নি, মসিয়ে ফস্-কে বন্দী করলেই তারা রক্ষা পাবে বলে আমি মনে করি।

রাষ্ট্রপতি সেইখানে বসেই মসিয়েঁ ফস্-কে ধরে আনবার জন্যে এক পরোয়ানা সই করে দিলেন। কয়েকজন প্রহরী চলে গেল।

আলভারো এবার চলে যাবার জন্যে উঠছিলেন, কিন্তু রাষ্ট্রপতি

তাঁকে বসতে ইঙ্গিত করে বললেন, মসিয়েঁ ফস্-এর সঙ্গে দেখা করে তবে যাবেন। তাঁরও কিছু বলবার তো থাকতে পারে।

আলভারো হেসে বললেন, এখনো আপনার মনে কিছু সন্দেহ আছে দেখছি। আচ্ছা, আমি বসলাম। কিন্তু আমার বিশ্বাস, মসিয়েঁ ফস্-এর সঙ্গে আর আমাদের দেখা হবে না।

রাষ্ট্রপতি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন ?

আলভারো বললেন, উন্মাদ হলেও তাঁর আত্মসম্মান জ্ঞান কিছু আছে। বন্দী হবার অপমান সহ্য করবার আগেই তিনি নিজের ব্যবস্থা করবেন।

রাষ্ট্রপতি বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, কে উন্মাদ ? মসিয়েঁ ফস্ ?

—হুঁ। উন্মাদ না হলে কেউ এমন ভয়ানক কাজ ভাবতে পারে ? বাইরে প্রকৃতিস্থ দেখালেও উন্মাদ তিনি অনেকদিন হয়েছেন— আজ পনেরো বছর ধরে তাঁর এই অবস্থা। একটু থেমে আলভারো আবার বললেন, আমার কথা কিছু-কিছু বিশ্বাস করলেও, কেন যে মসিয়েঁ ফস্ সমস্ত মানবজাতির এত বড় সর্বনাশের আয়োজন করেছিলেন তা আপনারা কেউ প্রশ্ন করেন নি। কিন্তু সমস্ত ব্যাপার জানবার পর এই প্রশ্নই আমার প্রথম মনে জাগে। মসিয়েঁ ফস্-এর সঙ্গে কথাবার্তায় তাঁর জীবনের যে কাহিনী আমি জানতে পারি তা থেকে তাঁর ভেতর এমন অদ্ভুত মতলব কী করে জাগতে পারে বোঝা যায় না। শুধু পনেরো বছর আগে একমাত্র মেয়ের মৃত্যু যে তাঁর বুকে বড় বেজেছিল এইটুকুই জানতে পেরেছিলাম। কিন্তু সে মেয়ের মৃত্যু সম্বন্ধে কোন কথাই তিনি বলতে রাজি নন দেখলাম। হঠাৎ একটা কথা মনে হওয়ায় তারপর আমি পুরোনো সংবাদপত্র খুঁজে দেখতে পেলাম, পনেরো বছর আগে তাঁর দশ বছরের মেয়ে তাঁর সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে আর্জেন্টিনার জঙ্গলেই হারিয়ে যায়। গভীর বনে অনেক খোঁজাখুজি করেও তাকে পাওয়া যায় না। এই খবর

জানবার পর সমস্ত রহস্য আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। আপনারা বোধহয় বুঝতে পেরেছেন, সেই মেয়ের মৃত্যুর পরই সমস্ত অরণ্যের ওপর মসিয়েঁ ফস্‌-এর অমানুষিক আক্রোশ জন্মায়। শোকে উন্মত্ত হয়ে অরণ্যের সমস্ত গাছপালাকেই তিনি পনেরো বছর ধরে তাঁর মেয়ের হত্যার প্রতিশোধ-স্বরূপ বিনাশ করবার চেষ্টা করছেন। তাঁর বিশেষ বৈজ্ঞানিক প্রতিভাই তাঁকে একাজে সাহায্য করেছে।

কিন্তু তাঁকে বন্দী করা যাবে না কেন ?

আলভারো মৃদুস্বরে বললেন, তাঁর সমস্ত কাজ যে ধরা পড়ে গেছে, তা জানিয়ে আমি তাঁকে একটা চিঠি আজ দিয়ে এসেছি। সে চিঠি পড়ার পর আর তিনি বন্দী হবার জন্যে বসে থাকবেন না।

রাষ্ট্রপতি একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, তবে তাঁকে বন্দী করে আনবার জন্যে আমাদের পিড়াপিড়ি করলেন কেন ?

আপনাদেরও কর্তব্য পালনের সুযোগ দেবার জন্যে। তাছাড়া আমার চিঠি সে মিথ্যে ভয় দেখাবার জন্যে লেখা হয়নি, আপনাদের সৈন্যেরা তাঁকে ধরতে না গেলে তিনি হয়ত বুঝতে পারতেন না।

সভার সবাই চুপ করে রইল। বোঝা গেল, মসিয়েঁ ফস্‌-কে ধরে না আনা পর্যন্ত সভায় আর কোন কাজ হবে না।

আলভারোর কথা যে মিথ্যে নয় তা প্রমাণ হতে কিন্তু দেরি হল না। খানিক বাদেই প্রহরীরা ফিরে এল। মসিয়েঁ ফস্‌-কে তারা ধরে আনতে পারে নি। তারা যাবার ঠিক আগেই পরীক্ষাগারের ভেতরে তিনি আত্মহত্যা করেছেন।

পরীরা কেন আসে না

পরীরা আর আসে না।

জামতাড়া কি জাঞ্জিবার—কোথাও না।

মেঘলা দুপুর কি জ্যোছনা রাত,—কখ্‌খনো না।

পরীরা বলতে গেলে একেবারে ফেরারি। তাদের আর পাত্তাই নেই। গা-ই তাদের নেই, তবু বলা যায় তারা বেমালুম গা-ঢাকা দিয়েছে।

অথচ এই সেদিন পর্যন্ত তাদের কখন না দেখা যেত, কোথায় বা নয়!

একটু নিরালা নির্জন জায়গা পেলে তো কথাই নেই। ঝিলের ধারে ঝাউতলায় কি বনের পারে বড় জলায় গিয়েছ কি, কোন-না-কোন পরী হাজির আছেই।

আর পরী দেখেছ কি, অমনি বর পেয়েছ। বর দেওয়া সম্বন্ধে তারা একেবারে মুক্তহস্ত, মানে মুক্তকণ্ঠ। বর দেবার জন্যে রীতিমত তাদের গলা সুড়সুড় করছে রাতদিন।

আর, বর বলতে সে কি যেমন-তেমন বর!

রাজ্য, রাজকন্যে তো কথায় কথায়! এমন কি হাঁচি কাশি দাঁত-কনকন পর্যন্ত সারাবার বর তারা আপনা হতেই, না চাইতেই দিয়ে বসে আছে।

তখন তাই ভাবনা-চিন্তা একরকম ছিল না বললেই হয়।

থাকবে কোথা থেকে?

গরিব গৃহস্থের বৌ হয়ত শাশুড়ির ভয়ে ভেবে সারা—বেড়ালে মাছ খেয়ে গিয়েছে হেঁসেল থেকে, এখন দজ্জাল শাশুড়িকে বোঝায় কী।

কিন্তু পরীরা থাকতে আবার ভাবনা।

ঠিক সময় বুঝে এক জলপরী কোথা থেকে এসে হাজির।

কাউকে কাঁদতে দেখলে তো আর রক্ষে নেই। জলপরী বর দেবার ফিকিরেই ঘুরে বেড়াচ্ছিল। গেরস্ত-বৌয়ের চোখে জল দেখেই দাঁড়িয়ে পড়ে বলে, কাঁদছ কেন গা ?

গেরস্ত-বৌ হয়ত অতটা খেয়াল করেনি, কে এসেছে না এসেছে। তাছাড়া পরীদের আসাটাও নেহাৎ নিঃসাড়ে আবছা রকম তো ? সে ঝঙ্কার দিয়ে বলে, আমি কাঁদছি তো তোমার কী গা ? আমি তো আর তোমার ছেরাদ্দের পিণ্ডি কেঁদে ভাসাই নি।

জলপরী এবার রেগে আগুন হয়ে ওঠে ভাবছ ?

উঁহুঃ, তাদের চটানো অত সহজ নয়। অত চট করে চটলে তাদের চলেই না। একেবারে মধুর মত মিষ্টি গলায় বলে, আহা রাগ কর কেন ? আমায় বলোই না কী তোমার দুঃখ !

গেরস্ত-বৌ এতক্ষণে জলপরীকে চিনতে পারে। চিনতে পেরে একেবারে জিভ কেটে লজ্জায় জড়সড়। প্রথমে তো কথাই বলবে না, তারপর অনেক পিড়াপিড়িতে অনেক কষ্টে জানায় যে তার হেঁসেল থেকে বেড়ালে মাছ চুরি করে খেয়ে গেছে। শাশুড়ি জানলে আর রক্ষে থাকবে না।

গেরস্ত-বৌয়ের মুখ থেকে কথাটা খসেছে কি না—ব্যস, জলপরী আর সেখানে নেই। তারপর চক্ষের পাতা পড়েছে কি না পড়েছে, আবার সে এসে হাজির।

আর, হাজির কি শুধু-হাতে ?

মোটেই না।

তার সঙ্গে মস্ত একটা—

ওমা, তাইতো ! সঙ্গে মস্ত একটা হুলো বেড়াল !

গেরস্ত-বৌ ফ্যালফেলিয়ে তাকিয়ে থাকে। জলপরীর মুখে

হাসি আর ধরে না। ভাবটা এই আর কি—কেমন, বলেছিলাম না, আমি থাকতে আর ভাবনা নেই!

পরীই হোক আর যে-ই হোক, গেরস্ত-বৌ আর তোয়াক্কা রাখে না। তার মেজাজ দস্তুরমত বিগড়ে গেছে। খরখরিয়ে বলে ওঠে—বলি, কেমনতর পরী গা তুমি!

জলপরী বেশ একটু হকচকিয়ে যায়. বলে, কেন এই তো—মানে এই তো সেই হুলো বেড়াল, যে তোমার হেঁসেলের মাছ খেয়েছে!

—তা, আমি কি ঐ হুলো বেড়াল ভেজে শাশুড়ীকে দেখাবো?—খেঁকিয়ে ওঠে দুখিনী গেরস্ত-বৌ।

জলপরী একেবারে অপ্রস্তুত।

ছাড়া পেয়ে হুলো বেড়াল তখন আড়াই পা গেছে কি না-গেছে, জলপরী মস্ত বড় এক মাছ—জলজ্যান্ত, জলের মাছ নিয়ে এসে হাজির।

সে মাছ নিয়েও কম ফ্যাসাদ নয়। মাছ বলে মাছ! সে মাছে অমন দশটা গেরস্তের জ্ঞাতি-ভোজন হয়ে যায়!

এত বড় মাছ নিয়ে এখন গেরস্ত-বৌ করে কী!

যা-ই করুক, আমাদের এখন তা ভাবলে তো চলবে না। আমাদের আসল কথাই বাকি।

হ্যাঁ, তারপর যা বলছিলাম,—পরীরা আসে না। আসে না আজ অনেক দিন।

পরীদের শেষ আবির্ভাবের তারিখ হল ১৮ই অগ্রহায়ণ, ১১১৯ সাল। এখানে অবশ্য জানিয়ে রাখা ভালো যে, এই তারিখ নিয়ে সামান্য একটু মতভেদ পণ্ডিত-মহলে আছে। বিশ্ববার্তা-সংগ্রহের সম্পাদকের মতে পরীদের শেষ আবির্ভাব ঘটে ৭ই অগ্রহায়ণ, ১১১৯ সালে। সাল ও মাস সম্বন্ধে কোন আপত্তি না করলেও

বিজ্ঞান-কল্পতরুর রচয়িতা বিশ্ববার্তা সংগ্রহের দেওয়া তারিখ সম্পূর্ণ কাল্পনিক বলে মনে করেন। তাঁর মতে পরীরা শেষ পৃথিবীতে দেখা দেয়—৭ই নয়, ১১ই অগ্রহায়ণ, ১১১৯ সাল।

বিশ্ববার্তা-সংগ্রহ ও বিজ্ঞান-কল্পতরুর মধ্যে এই তারিখের তর্ক নিয়ে দু-বছর ধরে যা যা লেখা হয়েছিল এবং পরে এই তর্ক মানহানির মোকদ্দমায় গড়ালে তাতে উভয় পক্ষ থেকে যা যা জেরা ও জবানবন্দীতে বলা হয়েছিল, সমস্ত পর্যালোচনা করে আমি এই সিদ্ধান্তই করেছি যে, ৭ এবং ১১ এই তারিখ নিয়ে যে গোলযোগ, এই তারিখ দুটি যোগ করে দিলেই তার মীমাংসা হয়ে যায়। কারুরই তখন কিছু আপত্তি করবার থাকে না এবং আপত্তি করলেই বা শুনবে কে?

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, ১৮ই অগ্রহায়ণ, ১১১৯ সালেই সর্ববাদি-সম্মতরূপে শেষ পরী শেষবার পৃথিবীতে দেখা দেয়।

কোথায় দেখা দেয় জানো? বিষমগড় রাজ্যের রাজপ্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যানবাটিকায় যুবরাজ পরমভট্টারক শ্রীশ্রীধুরন্ধররাম ধনুষ্টঙ্কারের সামনে।

পরীর আবির্ভাবের কাহিনী শুরু করবার আগে বিষমগড় রাজ্যের একটু বর্ণনা বোধহয় করা দরকার।

বিষমগড় রাজ্যটি হল ঠিক রামখেলখণ্ড রাজ্যের দক্ষিণে। রাম-খেলখণ্ড রাজ্যটি কোথায় যদি না জানা থাকে, তাহলে আমি নাচার! তবে, নিতান্ত অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞের জন্যে বিষমগড় রাজ্যের একটি চৌহদ্দি এখানে দিয়ে দেওয়া হল।

বিষমগড় রাজ্যের দক্ষিণে বিরাট মরুভূমি। তার পূর্বদিকে এক বিশাল তৃণপাদপহীন বালুকাময় প্রদেশ, আর পশ্চিমে যতদূর দেখা যায় শুধু বন্ধ্যা বালির সমুদ্র এবং তার উত্তরে—ওঃ! উত্তরে রামখেলখণ্ড বুঝি আগেই বলেছি? তা, যাই বলে থাকি, রামখেলখণ্ড আসলে এমন একটি জায়গা—যেখানে কি আকাশে,

কি নিচে, কোথাও জলের বাষ্পটি নেই। সেখানে না জন্মায় কিছু, না থাকে জনমনিষ্যি। সত্যি কথা বলতে কি রামখেলখণ্ডকে মরুভূমি বলে কেউ বর্ণনা করলে তার নামে মামলা আনা যায় না।

বিষমগড় রাজ্যের চারিধার যেমন সরস, সে রাজ্যের বাসিন্দাদের ভেতরটাও প্রায় তাই। তারা খায় দুবেলা দুমুঠো ভুট্টার দানা, আর চেনে শুধু সোনা। সে সোনা তাদের মাঠে ফলে না ; তবু সিন্দুকে কেমন করে জমা হয়, সেইটেই তাজ্জব ব্যাপার !

এই সোনা-সর্বস্ব দেশের মধ্যে সবচেয়ে সোনা-সেয়ানা হলেন কুমার শ্রীশ্রীধুরন্ধর ইত্যাদি। এই কুমার শ্রীশ্রীধুরন্ধরের সামনেই সেই ১১১৯ সালের অগ্রহায়ণের স্নিগ্ধ অপরাহ্ণে শেষ পরীর আবির্ভাব। তখন অস্তগামী সূর্যের স্বর্ণাভ কিরণে আকাশ পৃথিবীর —মানে, যা-যা হবার হয়েছে, বাগানে ফুলের গন্ধ নিয়ে বাতাস যা-যা করবার করেছে, এবং সাধারণত এরকম সময় আর যা-যা ঘটে থাকে, সবই ঘটেছে।

কুমার ধুরন্ধর তন্ময় হয়ে সূর্যাস্তের আলোয় রঙিন একটি মেঘের দিকে চেয়ে ছিলেন। (কেন চেয়ে ছিলেন সেটা পরে প্রকাশ পাবে)

হঠাৎ কাছেই মধুর গলায় তাঁর নাম উচ্চারিত হতে শুনে চমকে ফিরে তাকিয়ে দেখলেন, এক পরী।

এমন পরী দেখা কিছু অদ্ভুত নয়, কিন্তু পরী আবার ডাকল,—কুমার ধুরন্ধর !

বোঝা গেল পরী কুমারকে চিনে ফেলেছে। চিনে ফেলাটা সত্যিই অবশ্য আশ্চর্য। কারণ চেহারা দেখে ধুরন্ধরকে রাজকুমার বলে সন্দেহ করা অত্যন্ত কঠিন—প্রায় অসম্ভব বললেই হয়। মাথায় কেলে হাঁড়ি বসানো সর্গাট এবং সুদীর্ঘ একটি বংশদণ্ড, না তিনি—দেহ-সৌষ্ঠবে কে যে শ্রেষ্ঠ, তা বলা যায় না। তার ওপরে তাঁর একটা পা একটু খোঁড়া ও একটা চোখ কানা !

পরীদের সেই প্রাদুর্ভাবের দিনে এ-হেন পেটেণ্ট চেহারা কেমন করে যে পরীদের নজর ও বর বাঁচিয়ে এতদিন তিনি মজুদ রেখেছেন, তা ভাবলে অবাক হবার কথা। তবে শোনা যায়, দশ মাসের জায়গায় আট মাসে ভূমিষ্ঠ হওয়ায় পরীরা গোড়াতেই তাঁর পাত্তা পায়নি। তারপর থেকে একটু জ্ঞান হতেই তিনিও তাদের আমল দেননি। প্রথমত বিষমগড়ের রাজা অর্থাৎ তাঁর বাবার খেয়ালে কুমার ধুরন্ধর ছেলেবেলা থেকেই দেশদেশান্তরে ঘুরেই বেড়িয়েছেন এতদিন। সৌরাষ্ট্রের পরীরা তাঁর সন্ধান পেতে-না-পেতেই তিনি ঠিকানা বদলে গেছেন কোশলে আর কোশলের পরীরা বাড়ি ঘেরাও করতে এসে দেখেছে তিনি বাসা তুলে নিয়ে গেছেন কপিশায়।

এরকম ঘন-ঘন বাসা বদলাবার মূলে অবশ্য কুমারের বাবা, স্বয়ং বিষমগড়ের রাজা। মন্দ লোকে বলে যে বাড়িভাড়া ফাঁকি দেবার জন্যেই নাকি তাঁর এই ফিকির। দেশে থাকলে রাজার উপযুক্ত ঘটা করে থাকতে যে খরচাটা হত, বিদেশে বেনামিতে থাকার দরুন সেটা তো বেঁচে যায়ই, তার ওপর বাড়িভাড়াটা ফাঁকি দিতে পারলে সোনায় সোহাগা। মন্দ লোকের এসব কথা অবশ্য কানে না তোলাই উচিত। আমরা যতদূর জানি, ছেলেকে গোড়া থেকে দেশ-বিদেশের ব্যবসা-বুদ্ধিতে পাকা করবার জন্যেই বিষম-গড়ের রাজার এই বন্দোবস্ত।

এত সব বাধা সত্ত্বেও দু-একটা উটকো পরী কখনো-কখনো কুমার ধুরন্ধরকে আচমকা ধরে যে না ফেলেছে এমন নয়, কিন্তু কুমারকে কায়দা করতে পারেনি কেউ। ছেলেবেলা থেকেই ধুরন্ধরের কেমন পরী-টরির ওপর কোন প্রীতি নেই। আর সব ছেলে যখন খেলার নেশায় পরীদের সঙ্গে মেঘের দেশে উধাও হয়ে গিয়েছে, তখন কুমার ধুরন্ধর ঘরের কোণে বসে নামতা মুখস্থ

করছেন চক্র-বৃদ্ধি সুদের। পরীরা পরিচয় করতে এসে ধমক খেয়ে গেছে ফিরে। বহুদিন বাদে দেশে ফেরবার পর আজ এই প্রথম তাঁর পরীর হাতে পড়া।

আজকেও পরী বলে চেনামাত্র ধুরন্ধরের মুখের চেহারা যা হয়ে ওঠে—তাতে সে বেচারার বুক শুকিয়ে যায়। কিন্তু তারও আজ বড় দায়। সারা বেলাটা একদম বরবাদ গেছে। কাউকে বর দেবার সুযোগ মেলেনি। সেই দুঃখেই গতিক বিশেষ সুবিধের নয় বুঝেও, চট করে সে উবে যেতে পারে না। কোন রকমে সাহস করে দাঁড়িয়ে থেকে আপ্যায়িত করার চেষ্টায় হেসে বলে, আপনি মেঘের বাহার দেখছিলেন বুঝি?

—দেখছিলাম তো হয়েছে কী?—খেঁকিয়ে ওঠে ধুরন্ধর, মেঘের বাহার বুঝি আমাদের দেখতে নেই? ওরকম একখান মেঘে পাড় বসাতে ক-ভরি সোনার জরি লাগে কষে বলুন তো, কে কেমন ওস্তাদ দেখি!

আস্ফালনটা করে ফেলার পর ধুরন্ধরের বোধহয় খেয়াল হয়, সামান্য একটা পরীর কাছে এসব গভীর কথার কোন কদর নেই। ধমক দিয়ে তাই তিনি বলেন, কিন্তু তুমি এখানে কী মনে করে এসেছ বাপু?

পরী থতমত খেয়ে একটু শুকনো হাসি হেসে বলে, আমি সন্ধ্যাপরী! আপনার যদি কোন বর-টর দরকার থাকে—

ধুরন্ধরের ধমকে পরীকে আর শেষ করতে হয় না—যাও যাও, যাও যাও! ওসব বর-টর নিয়ে আমার কাছে সুবিধে হবে না। সরে পড় এইবেলা।

সন্ধ্যাপরী তবু একেবারে আশা ছাড়ে না। মিনতি করে বলে, কিন্তু দেখুন, এই আপনার চেহারা···

—কেন, আমার চেহারাটা কি খারাপ? বাঁকা সুরে জিজ্ঞাসা করেন ধুরন্ধর।

অত্যন্ত বিপন্ন হয়ে সন্ধ্যাপরী আমতা-আমতা করে বলে, না তা ঠিক নয়, মানে কি না…

—যাক, আর অত ঢোক গিলতে হবে না! আমার চেহারার ছিরি কি আর আমি জানি না? কিন্তু এ চেহারা বদলাবো কেন বল তো বাপু! বদলে আমার লাভ?

এমন কথা পরী তার পাখার জন্মে শোনেনি! সে একেবারে থ হয়ে যায়।

ধুরন্ধর বলে চলেন, তুমি বর দিয়ে আমার চেহারাটি ভাল করে দিতে চাও, এই তো? কিন্তু ভাল চেহারার ফ্যাসাদ জানো? এমন নির্বিঘ্নে নিশ্চিন্তে নিজের ব্যবসা আর করতে হবে না। আজ অমুক রাজকুমারীর উদ্যানসভা, কাল অমুক রাজার সঙ্গে নৌকোবিহার, এখানে নেমন্তন্ন, ওখানে বৈঠক—সবার ভালবাসার টানাটানিতে প্রাণ একেবারে যায় আর কি! চেহারা এমন বলেই না কেউ আর কাছে ঘেঁযে না! উঁহু বাপু, এ চেহারা আমি লাখ টাকাতেও বদলাচ্ছি না!

সন্ধ্যাপরী হতাশভাবে শেষ চেষ্টা করে বলে, তাহলে আর কোন বর?

—কী বিরক্ত কর বল তো তোমরা! রীতিমত চটে ওঠেন কুমার ধুরন্ধর,—কটা বর তোমরা দিতে পারো? কী বর? দুনিয়ার সেরা চুনি, চুনারের আঞ্জনী আমায় এক্ষুনি এনে দিতে পারো?

সন্ধ্যাপরী অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলে, এনে দিতে পারতুম, কিন্তু এইমাত্র আর-এক পরী এসে সেটা মদ্রদেশের এক ময়রাকে বর দিয়ে ফেলেছে। এখন সেটা টানাটানি করতে গেলে মাঝখানেই আটকে যাবে, কারুর কাছে পৌঁছবে না। এ সব হীরে-জহরতের দোষই এই! সবাই রাতদিন টানা-হ্যাঁচড়া করছে।

কুমার ধুরন্ধর দাঁত খিচিয়ে ওঠেন—থাক থাক! ওসব বক্তৃতা

আর শুনতে চাই না। মুরোদ তো তোমাদের কত, তা বেশ বোঝা গেছে!

মুখখানি কাঁচুমাচু করে সন্ধ্যাপরী বলে, কিন্তু আর কিছু যদি চান তাহলে আমি আপনাকে তিন-তিনটে ইচ্ছে—

ধুরন্ধর ইতিমধ্যে কি যেন ভাবেন, তাঁর কোটরে-ঢোকা ক্ষুদে চোখটি যেন চকচক করে ওঠে। অত্যন্ত প্যাঁচালো এক হাসি হেসে ধুরন্ধর বলেন, তিন-তিনটে বর দিতে পারো?

ভালোমানুষ পরী অতশত হাসির মর্ম বোঝে না, খুশি হয়ে বলে, নিশ্চয়ই! তিনটে বর দিতে পারি এখুনি।

—হুঁ! ধুরন্ধর খানিক পায়চারি করে বলেন, আচ্ছা, বল দেখি সমতটে সোনামুগের ভাও এখন কত?

সন্ধ্যাপরী, সাধুভাষায় যাকে বলে, ভ্যাবাচাকা! এমন বর কেউ কখনো ত্রিভুবনে শুনেছে! হতভম্ব হয়ে সে জিজ্ঞাসা করে, কী বললেন?

—কেন, এই সহজ কথাটা আর বুঝতে পারলে না? ধুরন্ধর হেঁকে ওঠেন,—বলছি, সমতটে সোনামুগের এখন দর কত? সৌরাষ্ট্রের ব্যাপারীদের কাছে ধর যদি এখন বায়না নিই, সঠিক দরটা জানা থাকলে সুবিধে কি কমখানি!

—কিন্তু এরকম বর তো হয় না। সন্ধ্যাপরী কাতর ভাবে জানায়।

হয়না কী রকম? বাঁকা নাক সোজা হয়, কানা চোখ ভালো হয়, আর সোনামুগের দর ঠিক হয় না? আলবৎ হয়! ধুরন্ধরের চোখ রাঙা হয়ে ওঠে—অবশ্য একটিমাত্র চোখ।

সন্ধ্যাপরী নিরুপায়! কী কষ্টে যে ধুরন্ধরের বায়নাকে মেটাতে হয়, সে-ই জানে। এ বর দান করে তাকে রীতিমত হাঁপাতে হয়!

কিন্তু ধুরন্ধরের কি তা বলে দয়ামায়া আছে! তাঁর উৎসাহ

এখন দেখে কে! একগাল হেসে বলেন, এবার আমার দ্বিতীয় বর, কেমন? আচ্ছা, বল তো বাপু,—

তেরো টাকা মণ সাঁচ্চা,
ভেজাল সেরে সতেরো কাঁচ্চা।
যায় নৌকায়
মণে ছটাক কলসীতে খায়।
কেরায়া যোজনে আধ পণ,
যায় দু-কুড়ি সাত যোজন।
কোটালের ঘুষ গণ্ডায় তিন কাক,
বাটখারায় টানি সেরে ছটাক।
কী দরে বেচে ঘি,
কাহনে তের পণ গুনে নি!

সন্ধ্যাপরী এবার কেঁদে ফেলে আর-কী। বলে, এ বর কিছুতেই সই নয়! কিন্তু ধুরন্ধরও নাছোড়বান্দা।

সন্ধ্যাপরীকে এ-বরও দিতে হয়। উড়ে যাওয়া তো দূরের কথা, তার আর বুঝি দাঁড়াবারও ক্ষমতা নেই।

নেহাৎ মরণ নেই বলেই বুঝি ঠোঁটের ডগায় তার প্রাণটি এসে ঠেকে থাকে।

কুমার ধুরন্ধর ধনুষ্টঙ্কার খুশি হয়ে হেসে বলেন, যাক, খুব একটা হ্যাঙ্গাম ঘুচল। এই হিসেব নিয়ে তোরোজন সরকার আজ তিন দিন হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে!

—নিন শেষ বর চেয়ে, তারপর এবার আমায় রেহাই দিন। করুণস্বরে মিনতি করে পরী।

—এই যে দিচ্ছি! বলে ধুরন্ধর হেসে ওঠেন। তারপর বলেন,—

বরের হোক এমনি গুণ,
যত পেলাম পাই তার তিনগুণ।

সন্ধ্যাপরী একেবারে আঁৎকে উঠে বলে, তার মানে ?

—তার মানে, যত বর পেয়েছি, এখন তার তিনগুণ অর্থাৎ তিনি তিরিক্ষে ন-টি বর আমার পাওনা। এই আমার তিনের ইচ্ছে।

—কখ্খনো না! কিছুতেই না! এ আপনার জুয়াচুরি! নেহাৎ প্রাণের দায়েই সন্ধ্যাপরী উঠে দাঁড়ায়।

ধুরন্ধর হেসে বলেন, জুয়াচুরি নয় গো, জুয়াচুরি নয়, এরই নাম ব্যবসাদারি! তোমাদের এত গুণ আগে কি বুঝেছি! এখন চল দেখি, খাতায় হিসেবটা লিখিয়ে ফেলিগে। বর ফুরোবার আগেই আবার বাড়িয়ে নিতে না ভুলে যাই!

তারপর বিষমগড়ের রাজকুমারের ব্যবসা দিন দিন যেমন ফেঁপে ওঠে, সন্ধ্যাপরীর দুঃখের তেমনি আর সীমা থাকে না। নিজের কথার ফাঁদে, দিনরাত ধুরন্ধরের সেই কারবারি গদিতে সে বন্দী। একদফা বর ফুরোতে-না-ফুরোতে কুমার ধুরন্ধর তিনদফা বর বাড়িয়ে নেন—সন্ধ্যাপরীর ছুটি পাবার আশা অনেকদিন আগেই ঘুচে গেছে।

সন্ধ্যাপরী কোনদিন যদি মিনতি করে ছুটি চায়, কুমার ধুরন্ধর অমনি সরকারকে খাতা খুলে হিসেব দেখতে বলেন।

দেখ তো সরকার, সন্ধ্যাপরীর হিসেবটা! সরকারমশাই খাতা খুলে পড়েন,—জমা—২১০৬৮১, খরচ ১৭১৯৮।

কুমার ধুরন্ধর একটু হেসে বলেন, এখনো যে অনেক বর বাকি! এ হিসেবটা চুকে যাক আগে, তারপর তো ছুটি!

সন্ধ্যাপরী জানে, এ হিসেব আর কোনদিন চুকে যাবার নয়। মনের দুঃখে তার কাঁচবরণ রূপে কান্নার চিড় ধরে, তার সোনালি পাখায় পড়ে পেতলের কলঙ্ক।

এমনি করেই দিন হয়ত যেত। ধুরন্ধর ধনুষ্টঙ্কারের কারবারের ভেতর গোটা দুনিয়াই যেত পড়ে বাঁধা। কিন্তু একদিন সন্ধ্যায় এক কাণ্ড যায় ঘটে।

সন্ধ্যাপরী তখন প্রায় সব আশাই ছেড়েছে। সারাদিন ব্যবসাদারি হিসেব আর দেশ-বিদেশের বাজার-দর কষে তার মাথা ঝিমঝিম—চোখে সরষেফুল!

ধুরন্ধর কিন্তু সারাদিনের লাভের হিসেব নিয়ে তখনও মশগুল।

নেহাৎ মরীয়া হয়েই পরী শেষবার ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে। কাঁদুনিতে কিছু হবার নয় সে বুঝেছে।

—আচ্ছা, তোমার প্রাণে কি একটু শখও নেই? আমোদ, আহ্লাদ, ফুর্তি—কিছু না? লাভের সোনা তো থাকে সিন্দুকে, চোখেও দেখতে পাওনা; শুধু খাতার হিসেব দেখেই সুখ?

ধুরন্ধর ধনুষ্টঙ্কার একগাল হেসে বলেন,—কী সুখ তা যদি বুঝতে! ইচ্ছে হয় ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এই হিসেবের স্বপনই দেখি······

—অ্যাঁ! সন্ধ্যাপরী হঠাৎ চমকে ওঠে। তারপর ধুরন্ধর হাঁ করবার আগেই বলে দেয়—তথাস্তু!

পরের দিন সকালে চাকর-বাকর ঘরে এসে দেখে কুমার শ্রীশ্রী ইত্যাদি হিসেবের খাতা বুকে করে হাসিমুখে ঘুমোচ্ছেন। সে ঘুম আজও তাঁর ভাঙেনি।

আর সন্ধ্যাপরী? সে আর সেখানে একদণ্ড থাকে!

পরী-মুল্লুকে সেই যে সন্ধ্যাপরী ফিরে গেছে, তারপর থেকে কোথাও কোন পরী আর মানুষের ত্রিসীমানায় ঘেঁষে না। সাহস করে না বোধহয়।

সত্যি, পরীরা আর আসে না।

গল্পের স্বর্গে

গল্পের স্বর্গে মহা হুলুস্থূল !

ভাবছ, গল্পের স্বর্গ আবার কী? বাঃ! গল্পের স্বর্গ আছে বৈকি! পৃথিবীর ছোট বড়, বড় ছোট, সকলের জন্যে যত ভালো গল্প এ-পর্যন্ত যাদের নিয়ে লেখা হয়েছে তারা সব সেই স্বর্গে গিয়ে বাস করে। সেই স্বর্গে হুলুস্থূল কাণ্ড! যেদিকে ফেরা যায়, তর্ক, বচসা, ঝগড়া! নেহাৎ স্বর্গ বলেই বোধহয় কথা-কাটাকাটি মাথা-ফাটাফাটি পর্যন্ত পৌঁছচ্ছে না।

বিমল আর কুমারের অবশ্য এতে মজাই লাগছে। তারা নতুন এ-স্বর্গে এসেছে। একটা কিছু হুজুগ হলে তাদের ভালোই হয়। তাদের সঙ্গে জুটেছে টম সয়্যার আর হাকলবেরি ফিন আর যত ডানপিটে ভবঘুরে বাউণ্ডুলে ছেলের দল। বুদ্ধির ফোড়ন দেবার জন্যে আছে দুষ্টুমির রাজা পিটার প্যান। লাগুক না একটা হৈ চৈ হুলুস্থূল—তা নাহলে স্বর্গের খাওয়া হজম হয়!

কিন্তু এত হুলুস্থূল কী নিয়ে? সেই কথাটাই বুঝি বলতে ভুলেছি! ব্যাপারটা শুরু হয়েছে একটা পায়ে দাগ নিয়ে। তারপর অবশ্য অনেক দূরে গড়িয়েছে।

স্বর্গের এলাকার বাইরে রবিনসন ক্রুসো সেদিন গেছলেন বেড়াতে। এরকম বেড়িয়ে বেড়ানো তাঁর স্বভাব। ছাগলের চামড়ার আলখাল্লাটি গায়ে দিয়ে সেকেলে মরচে-পড়া গাদা-বন্দুকটি নিয়ে তিনি খেয়ালমত যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ান। স্বর্গে নইলে তাঁর মন টেঁকে না। সেদিন এমনি একা-একা কল্পনার সমুদ্রের ধারে অনেক দূর টহল দিয়ে ফিরছেন, এমন সময় দেখেন, বালির ওপর একটি পায়ের দাগ। পায়ের দাগ দেখেই ক্রুসোর

চক্ষুস্থির। এখানে এমন পায়ের দাগ হবার তো কথা নয়। এ দিকে তিনি ছাড়া আর কেউ কোনদিন ভুলেও আসে না। তবে এ কি তাঁরই পায়ের দাগ? না, তা-ই বা হবে কেমন করে। প্রথমত এ হল খালি-পায়ের দাগ। তিনি তো আর খালি পায়ে কখনো ঘোরেন না। দ্বিতীয়ত, এ পায়ের দাগ যে অনেক বড়! একবার তাঁর মনে হয়েছিল হয়ত মৌগলি বা টারজানের পায়ের দাগ এটা হতে পারে। গল্পের স্বর্গে তিনি ছাড়া তারাই যা একা-একা ঘুরে বেড়ায়। পাও তাদের খালি থাকে। তবে, তারা নন্দনবনের ভেতরেই বেড়াতে ভালোবাসে; সমুদ্রের তীর বড় পছন্দ করে না। তাছাড়া মৌগলি ও টারজানের চেয়েও এ পায়ের দাগ যে অনেক বড়। গোটা-দশেক টারজানের পা এর ভেতর ঢুকে যেতে পারে!

তবে? ক্রুসো এবার ভয়ে রীতিমত ঘেমে উঠলেন। গল্পের স্বর্গে কোন অজানা শত্রু কি তাহলে হানা দিয়েছে? এত বড় যার পা, সে তো সামান্য কেউ-কেটা নয়! স্বর্গের কী বিপদ আসন্ন কে জানে! হন-হন করে পা চালিয়ে ক্রুসো স্বর্গের দিকে ছুটলেন। খবরটা এখনি সেখানে দেওয়া দরকার।

সমুদ্রতীর ছাড়িয়ে স্বর্গের ঘন জঙ্গল; সেখানে বড়-বড় গাছের ডালপালা, শেকড়ে জংলি লতায় কাঁটায় জড়াজড়ি, তার ভেতর দিয়ে তাড়াতাড়ি যাওয়া তো সোজা নয়। ভাগ্যক্রমে যদি টারজান কি মৌগলির সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, তাহলে তাদের দিয়ে খবরটা তাড়াতাড়ি স্বর্গে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব—জঙ্গলের ভেতর দিয়ে তারা অনায়াসে চলাফেরা করে। জঙ্গলের রাস্তাই তাদের কাছে সোজা।

কিন্তু দেখা হবি তো হ একেবারে দুজনের সঙ্গেই একসঙ্গে। ওপরে গাছের ঝুরি ধরে ঝুলছে টারজান—নিচে নেকড়ে ভাইদের নিয়ে চলেছে মৌগলি।

—কী খবর, মিঃ ক্রুসো? এত তাড়াতাড়ি কিসের?

—কী ক্রুসো সাহেব, এত ব্যস্ত কেন ?

ক্রুসো বললেন, খবর বড় খারাপ। তোমাদের একজনকে তাড়াতাড়ি একবার যেতে হবে স্বর্গে। কিন্তু আর কিছু বলা আর তাঁর হল না।

—টারজান আবার খবর নিয়ে যাবে কী ! ভারি তো ওর মুরোদ ! ও তো আমার বাজে নকল ! বলে মৌগলি একেবারে খাপ্পা !

টারজান চটে গিয়ে বললে, ঈস্, নকল বললেই হল ! তুই তো নেকড়ের ছানা, থাকিস তো ভারি ভারতের জঙ্গলে ! দেখেছিস আফ্রিকার জঙ্গল ?

মৌগলি জবাব দিলে, তুই তো গেছো বাঁদর ! আর, তোকে জঙ্গল আগে চেনালে কে শুনি ?

ক্রুসো বুঝলেন, এদের দিয়ে কোন কাজ আর হবার নয়। এদের আজন্ম রেষারেষি। সুতরাং কতক্ষণ এ-তর্ক আর চলবে কে জানে ! তিনি তাড়াতাড়ি এগিয়ে চললেন।

বন-জঙ্গল ভেঙে স্বর্গের গেটে যখন পৌঁছলেন তখন বেলা পড়ে এসেছে। গেটেই প্রভুভক্ত ফ্রাইডের সঙ্গে দেখা। মনিব তাকে বেড়াবার সময় যেদিন সঙ্গে নেন না, সেদিন সে এমনি করে তাঁর অপেক্ষায় গেটে দাঁড়িয়ে থাকে।

—শিগগির ফ্রাইডে, শিগগির স্বর্গের পাগলা-ঘন্টি বাজিয়ে দাও !

ফ্রাইডে তবু হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে।

ক্রুসো একটু বিরক্ত হয়েই বললেন, তবু হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে দেখ ! এতদিন আমার সঙ্গে থেকেও কি তোমার বুদ্ধি খুলল না ! যাও শিগগির !

ফ্রাইডে থতমত খেয়ে বললে, আবার পাগলা-ঘন্টি বাজাবো !

—আবার মানে ?

—আজ্ঞে, খানিক আগে যে পাগলা-ঘন্টি বেজেছে ! সবাই তো এখন তাই সভায়।

পাগলা-ঘন্টি বেজেছে! তার মানে? তিনি পৌঁছবার আগেই তাহলে শত্রুর খবর স্বর্গে সবাই পেয়ে গেছে! ক্রুসো হন্তদন্ত হয়ে সভার দিকে ছুটলেন। পেছনে ফ্রাইডে।

স্বর্গের সভায় আজ আর লোক ধরে না! স্বর্গ তৈরি হওয়া অবধি তো কোনদিন এমন করে পাগলা-ঘন্টি বাজেনি!

ক্রুসো অনেক কষ্টে ভিড় ঠেলে সভায় ঢুকলেন। সভার মাঝখানে মহারাজা বিক্রমাদিত্য দুধারে তালবেতালকে নিয়ে বসে আছেন, তাঁর এক পাশে হারুন-অল-রসিদ আর সিন্ধবাদ, আর এক পাশে একটি আসন ক্রুসোর জন্যে খালি, তাঁর পাশে গালিভার ডার্টাগ্নান, অ্যাথস, আরামিস, পোর্থসকে নিয়ে বসে আছেন। তাছাড়া হোমরা-চোমরা চুনোপুঁটি কেউই বাদ আছে বলে মনে হয় না।

নিজের আসনে গিয়ে ক্রুসো যখন বসলেন, তখন সিন্ধবাদ বক্তৃতা দিতে উঠেছেন। তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতা থেকে সভার আসল উদ্দেশ্য কিছুই বোঝা যায় না। তিনি নিজের সব ভ্রমণ-কাহিনী ফলাও করে বলতেই ব্যস্ত।

ক্রুসো পাশের দিকে ঝুঁকে গালিভারকে জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপারটা কী বলুন তো?

—বাঃ, ব্যাপারটা আপনি শোনেন নি? আজ দুপুর থেকে অ্যালিসকে পাওয়া যাচ্ছে না যে! গেটের বাইরে কি কাজে বুঝি গেছল, তার পর থেকেই সে নিখোঁজ। স্বর্গে এমন ব্যাপার কখনো ঘটেনি……

ক্রুসো আর কিছু শোনবার জন্যে অপেক্ষা করলেন না। তৎক্ষণাৎ উত্তেজিতভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, সভাপতির অনুমতি নিয়ে আমি কিছু বলতে চাই। অ্যালিসের অন্তর্ধান হওয়ার রহস্য বোধহয় তাতে কিছু পরিষ্কার হতে পারে।

সিন্ধবাদ বিরক্ত হয়ে বললেন, এ-রকম ভাবে বাধা দেওয়া অত্যন্ত অন্যায়। রক্ পাখির ডিম কী করে ফুটল আমার এখনো বলাই হয়নি।

ভিড়ের ভেতর থেকে কে-একজন কচকে ছেলে বলে উঠল, সে ডিমে ততক্ষণ আপনি তা দিন। আমরা কাজের কথা শুনতে চাই।

সভায় একটা সোরগোল উঠল। বিক্রমাদিত্য নিজে উঠে গোল থামিয়ে সিন্ধবাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে বললেন, আপনার এ অপরূপ গল্প কি যেখানে-সেখানে বলবার জিনিস! আপনি বরং সময় করে আমায় একসময় শোনাবেন।

সিন্ধবাদ খুশি হয়ে এবার বসে পড়লেন। বিক্রমাদিত্যকে গল্প শোনানো তাঁর অনেক দিনের সাধ। ক্রুসো এবার তাঁর নিজের আবিষ্কারের কথা শুনিয়ে বললেন, আমার বিশ্বাস অ্যালিসের অন্তর্ধানের সঙ্গে এ পায়ের দাগের কোন সম্বন্ধ আছে।

তাঁর কথা শেষ না-হতেই কাঁধে একটা টিয়াপাখি নিয়ে সদাশিবের মত ভালোমানুষ চেহারার একজন উঠে দাঁড়ালো। একটা পা তার কাঠের।

মধুর হেসে সবাইকে আপ্যায়িত করে সে বললে, আমি নেহাৎ সাদাসিধে বোকাসোকা লোক, কিন্তু সকলের কথা শুনে আমার মনে হচ্ছে, অকারণে আমরা হৈ-চৈ করছি। অ্যালিসের অন্তর্ধান হওয়াটা এমন কিছু আশ্চর্য ব্যাপার নয়। কে না জানে তার স্বভাব! আবার সে আয়নার পেছনেই যে গলে যায়নি, তা-ই বা কে বলতে পারে! আর মিঃ ক্রুসোর প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা থাকলেও আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, পায়ের দাগ দেখা তাঁর একটা বাতিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং মিছিমিছি এই ব্যাপার নিয়ে স্বর্গের শান্তি নষ্ট করবার কী দরকার?

তার কথা শেষ না-হতেই টম সয়্যার বলে উঠল, হ্যাঁ গো খোঁড়া সিলভার! তোমায় আমরা চিনি! তোমার মিষ্টি কথায় আর আমরা ভুলি না! অ্যালিসের ব্যাপারে তোমার কিছু হাত আছে বলে সন্দেহ হচ্ছে!

কোথায় গেল সে সদাশিবের মত চেহারা! এক মুহূর্তে সিলভার একেবারে সাক্ষাৎ শয়তানের মূর্তি ধরল। পাশ থেকে অ্যালান

কোয়াটারমেন ধরে না ফেললে কাঠের ঠেঙো দিয়ে সে বুঝি টমকে গুঁড়োই করে ফেলত!

এবারে হট্টগোল থামতে বেশ দেরি হল। বিমল আর কুমার এতক্ষণ চুপ করে সমস্ত ব্যাপার দেখছিল। এইবার বিমল উঠে বললে, অ্যালিসের খোঁজ যদি করতে হয়, তাহলে সভা করে বক্তৃতা দিয়ে সময় নষ্ট করে কোন লাভ আমাদের আছে কি? মিঃ ক্রুসো যে পায়ের দাগ দেখেছেন, তা থেকে আমরা অনেক সন্ধান বোধহয় পেতে পারি।

সিলভার ভেঙিয়ে বললে, কেমন করে শুনি?

কুমার হেসে বললে, কেন, শার্লক হোমস্ কী করতে আছেন? পায়ের দাগ থেকে তিনি চেষ্টা করলে যার পা তার কুষ্ঠি-ঠিকুজি পর্যন্ত বার করে দিতে পারেন।

সভায় গোল উঠল—ঠিক, ঠিক! ডাকো শার্লক হোমস্‌কে!

তারই ভেতর একটি রোগাটে লম্বা ছোকরা উঠে বললে, আপনাদের ব্যস্ত হতে হবে না। শার্লক হোমস্‌কে ডাকবার দরকার নেই। আমি আর কর্তা এখুনি চললাম পায়ের দাগের খোঁজে। আজই অ্যালিসকে স্বর্গে পৌঁছে দিয়ে তবে আমাদের ছুটি।

—ব্লেকের শাকরেদ স্মিথ না? লিওর গুরু হলি হেসে বললেন, থাক বাবা থাক, তোমাদের আর গিয়ে কাজ নেই! অনেক কষ্টে স্বর্গে ঢুকেছ, একবার বেরুলে আর হয়ত ফিরতেই পারবে না।

সকলে হেসে উঠল। টম বিমলকে কনুইয়ের গুঁতো মেরে বললে, কুৎসিত চেহারার ও রসিক বুড়োটা কে হে?

—বাঃ, ওকে চেন না! আফ্রিকার মাঝখানে পাঁচ হাজার বয়সী আয়েশাকে ও-ই তো লিওর সঙ্গে খুঁজতে গেছল। পড়নি 'শী'র গল্প?

* * *

ক্রুসোর সঙ্গে হোমস্‌কে নিয়ে সমুদ্রের ধারে স্বর্গের হোমরা-চোমরা সবাই এসেছেন পায়ের দাগ পরীক্ষা করতে। শার্লক হোমস্

অনেকক্ষণ ধরে নানাভাবে সে দাগ পরীক্ষা করে বললেন, কী বুঝলে ওয়াটসন?

টাক-মাথা নিরীহ চেহারার একটি লোক অত্যন্ত ভক্তিভরে এতক্ষণ হোমসের সব কাজ লক্ষ্য করছিলেন। বিনীত ভাবে তিনি বললেন, আমি কী বলব বল! যা বলব, তুমি তো সব পালটে দিয়ে আমায় বোকা বনিয়ে ছাড়বে। তার চেয়ে আমার চুপ করে থাকাই ভালো।

হোমস্ একটু হাসলেন, সে মন্দ কথা নয়। তারপর সকলের দিকে ফিরে বললেন, আমার দেখা শেষ হয়েছে।

—কী, দেখলেন কী? সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

—দেখলাম একটা পায়ের দাগ।

—আহা! সে তো আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছি।

—কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না, শার্লক হোমস্ বেশ একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই বললেন—দেখতে পাচ্ছেন পঞ্চাশ ফুট লম্বা একটা চেহারা? দেখতে পাচ্ছেন গায়ে তার ভালুকের মত লোম? দেখতে পাচ্ছেন বিকট দাঁতাল তার গরিলার মত মুখ? দেখতে পাচ্ছেন হাতের তেলোয় তার অ্যালিস বসে কাঁদছে? দেখতে পাচ্ছেন……

একজন বাধা দিয়ে বললে, আপনি এইসব দেখতে পাচ্ছেন?

—এই সব কেন, আরো অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছি তার মনে কী ঝড় বইছে, বুঝতে পারছি কী সে চায়।

—কী চায়?

—চায় স্বর্গে ঢুকতে, স্বর্গের একজন হতে।

—স্বর্গের একজন হতে চায়! কে সে? গালিভার মাথা চুলকে বললেন, ব্রবডিঙন্যাগএ সবাই এরকম পঞ্চাশ ফুট লম্বা হয় দেখেছি, কিন্তু তাদের গায়ে তো লোম নেই, গরিলার মত চেহারাও তাদের নয়!

বিমল বললে, হিমালয়ের পাহাড়ে, সুন্দরবনের জঙ্গলে,

আমরাও অনেক দানবদের পাল্লায় পড়েছি, কিন্তু তাদের সঙ্গেও তো বর্ণনায় মিলছে না।

হঠাৎ কুমার চিৎকার করে উঠল, বুঝেছি, বুঝেছি।

—কী বুঝেছ ছোকরা? হোমস্ জিজ্ঞাসা করলেন।

—এ আর কেউ নয়, কিং কং।

—কিং কং! সে আবার কে?

—সে আছে একজন, গরিলা আর মানুষ আর দানব মিলে তৈরি। নিউইয়র্কে গিয়ে ভয়ানক কাণ্ড বাধিয়ে তুলেছিল। তার বায়োস্কোপ হয়েছে।

ডার্টাগ্নান, অ্যাথস, আরামিস, পোর্থস সবার আগে প্রবল-ভাবে মাথা নেড়ে বললেন, ও বায়োস্কোপ-ফায়োস্কোপ বুঝি না। মাথামুণ্ডু হয় না, আজগুবি যাকে-তাকে স্বর্গে স্থান দেওয়া কিছুতেই হতে পারে না! স্বর্গের তাহলে আর মর্যাদা রইল কিসের! একবার গেট আলগা করলে কাকে বাদ দিয়ে কাকে ঢোকাবো? ভিড়ের চোটে আমাদেরই তো জায়গা হবে না।

—কিন্তু অ্যালিসের উদ্ধার তো দরকার! অ্যালিসকে স্বর্গে ঢোক-বার জন্যেই যে চুরি করেছে! মাস্টারম্যান রেডি একটু হেসে বললে।

মহা সমস্যার কথা! সকলেই সকলের মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন। স্বর্গের দরজা বন্ধ করলে অ্যালিসকে ফিরে পাওয়া যায় কী করে!

এবার ডার্টাগ্নান তলোয়ার খুলে লাফিয়ে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিন মাস্কেটিয়ার বন্ধু—আচ্ছা, আমরা যাচ্ছি অ্যালিসকে উদ্ধার করতে। মানুষের সঙ্গেই আমরা কারবার করেছি বটে চিরদিন, আজগুবি দানবের সঙ্গে নয়, তবু আমরা ডরাই না। স্বর্গের মান আমরা রাখবই।

বিমল ও কুমারও এগিয়ে এল, সঙ্গে টম সয়্যার, হাকলবেরি ফিন, আরো আরো অনেকে—আমরাও ডরাই না, অনেক বিপদ আমরা

তুচ্ছ করেছি, অনেক দৈত্য-দানবের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে!

কিন্তু এসব আস্ফালন কোন কাজে লাগল না। হঠাৎ বনের মাথা ছাড়িয়ে এক বিরাট মূর্তি দেখা দিল। চার ধাপে মাইলখানেক পথ পেরিয়ে এসে সে-মূর্তি তাদের কাছে থেমে, হাতের তেলো থেকে অ্যালিসকে বালির ওপর নামিয়ে দিলে। তারপর বললে,—

এই নাও তোমাদের অ্যালিস! বাব্বাঃ, ঐ একরত্তি মেয়েকে সামলাতে আমার জান বেরিয়ে গেছে! মেয়ে নয় তো, যেন পুলিশ-কোর্টের গোটা বার-লাইব্রেরি! মেশিনগানের গুলি খেয়েছি, কিন্তু ওর জেরার চোটে তার চেয়ে বেশি ঝাঁঝরা হয়ে গেছি!—কে তুমি, কোথাকার তুমি, কেন তুমি,—কত জবাব দেওয়া যায়!

খানিকক্ষণ কারুর মুখে আর কথা নেই। অবশেষে বিক্রমাদিত্য বললেন, তাহলে—স্বর্গে তুমি আর যেতে চাও না?

—ছোঃ! তোমাদের স্বর্গ আমি বুঝে নিয়েছি! আর আমার তাতে কোন রুচি নেই। সেখানে আমার যুগ্যি আছে কে? মাথা হেঁট করে তোমাদের সঙ্গে কথা বলতেই তো ঘাড়ে ব্যথা হয়ে যাবে! তা ছাড়া ও নির্বংশ পুরীতে আমি থাকতে চাই না।

—তার মানে? হারুন-অল-রসিদ জিজ্ঞাসা করলেন।

—তার মানে তোমার সবাই তো আঁটকুড়ো, এক পুরুষেই শেষ! আর আমার ছেলে ইতিমধ্যেই লায়েক হয়ে উঠেছে, তারপর তার নাতি, নাতির নাতি যে হবে না কেউ বলতে পারে? এমনকি, একটি নাৎনিরও সম্ভাবনা আছে। তাদের নিয়ে আমি নিজের স্বর্গ নিজেই করে নেব!

—তা বেশ, তা বেশ!

স্বর্গের সবাই হাঁফ ছেড়ে বললেন।